উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে "এ" গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই 12B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, ২০২০)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- "কোর কোর্স", "ইলেকটিভ কোর্স", 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স' "স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স", "এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স" এবং ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF), National Credit Framework (NCrF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি
উপাচার্য

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY
Four Year Undergraduate Degree Programme
Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF)
& Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes
Bachelor of Arts in Education (Honours) (<Education>) [<NED>]
Course Type: Discipline Specific Core (DSC)
Course Title: Sociological Foundation of Education
Course Code: 6CC-ED-03

1st Print: February, 2025
Print Order: SC/DTP/25/059. 24/02/2025

Printed in accordance with the regulations of the University Grants Commission Distance Education Bureau

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

Four Year Undergraduate Degree Programme

Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes

Bachelor of Arts in Education (Honours) (<Education>) [<NED>]

Course Type: Discipline Specific Core (DSC)

Course Title: Sociological Foundation of Education

Course Code: 6CC-ED-03

: বিষয় সমিতি :

: সদস্যবৃন্দ :

Dr. Atindranath Dey
Director, SoE, NSOU, Chairman (BoS)

Dr. Sibaprasad De
Professor, SoE, NSOU

Dr. K. N. Chattopadhyay
Professor, Dept. of Education, University of Burdwan

Dr. Abhijit Kr. Pal
Professor, Dept. of Education, West Bengal State University

Dr. Dibyendu Bhattacharyya
Professor, Dept. of Education, University of Kalyani

Dr. D. P. Nag Chowdhury
Professor, SoE, NSOU

Dr. Papiya Upadhyay
Assistant Professor, SoE, NSOU

Dr. Parimal Sarkar
Assistant Professor, SoE, NSOU

Dr. Nimai Chand Maiti
Professor, SoE, NSOU

: Course Writer :
Dr. Parimal Sarkar
Assistant Professor, SoE, NSOU

: Course Editor :
Dr. Nimai Chand Maiti
Professor, SoE, NSOU

: Format Editing :
Dr. Papiya Upadhyay
Assistant Professor, SoE, NSOU

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোরকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অনন্যা মিত্র
নিবন্ধক (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত)

UG : SOCIOLOGICAL FOUNDATION OF EDUCATION

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

Four Year Undergraduate Degree Programme

Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes

Bachelor of Arts in Education (Honours) (<Education>) [<NED>]

Course Type: Discipline Specific Core (DSC)

Course Title: Sociological Foundation of Education

Course Code: 6CC-ED-03

পর্যায় ১

শিক্ষা ও সমাজতত্ত্ব

একক ১ ❑ সমাজ তত্ত্ব 9-15

একক ২ ❑ শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব. 16-20

একক ৩ ❑ শিক্ষা ও সমাজ (Education and Society) 21-29

পর্যায় ২

সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিত

Perspectives on Sociology of Education

একক ৪ ❑ শিক্ষাশ্রয়ী সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি (Sociology as the Foundation of Educational Studies) 33-38

একক ৫ ❑ সামাজিকতার ধারণা 39-48

একক ৬ ❑ বহুসংস্কৃতির শিক্ষা (Multicultural Education; Meaning, Characteristics, Goals and Dimension) 49-58

একক ৭ ❑ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া : ধারণা এবং তাৎপর্য (Socialization Process : Concept and Its Significance) 59-65

একক ৮ ❑ সামাজিক গোষ্ঠী : ধারণা ও বৈশিষ্ট্য এবং শিক্ষার ভূমিকা (Social Group : Concept and Characteristics, and Role of Education) 66-71

একক ৯ ❑ সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ ও ভূমিকা : প্রাথমিক গোষ্ঠী, গৌণ গোষ্ঠী এবং নির্দেশক গোষ্ঠী (Types and roles of social groups : Primary, Secondary and Tertiary). 72-85

একক ১০ ❑ সামাজিক পরিবর্তন : ধারণা, উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার ভূমিকা (Social Change: Concept, Scope and Role of Education) 86-90

একক ১১ ❑ ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার সামাজিক পরিবর্তন (Social Change in India; Sanskritization, Westernization, Modernization and Globalization) 91-112

একক ১২ ❑ সামাজিক সংযোগ : আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক (Social Communication : Formal and Informal) 113-116

পর্যায় ৪

Indian Social Ethos

একক ১৩ ❑ বহুত্ববাদী সমাজ হিসাবে ভারতবর্ষ (Indian as a Pluralistic Society) 119-123

একক ১৪ ❑ সামাজিক বৈচিত্র্য এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি (Social Diversity and Inclusion) 124-133

একক ১৫ ❑ শিক্ষা ও সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা (Education and Contemporary Social Issues : Population Explosion, Unemployment, Poverty and Illiteracy) 134-138

পর্যায় ১

শিক্ষা ও সমাজতত্ত্ব

একক ১ ❑ সমাজ তত্ত্ব

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ ভূমিকা

১.৩ সমাজতত্ত্বের অর্থ ও ধারণা

১.৪ সমাজতত্ত্বের প্রকৃতি

১.৫ সমাজতত্ত্বের পরিধি

১.৬ সারসংক্ষেপ

১.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

১.৮ অভিসম্বন্ধ / References

১.১ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায় পড়ার পর, শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবগত হবেন।

- সমাজতত্ত্বের অর্থ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা অর্জন করবেন।
- সমাজতত্ত্বের পরিধি সম্বন্ধে অবগত হবেন।
- সমাজতত্ত্বের প্রকৃতি বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা লাভ করবেন।

১.২ ভূমিকা

সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে নানা প্রাণীকুলের সাথে সহবস্থান করে এসেছে। এই পারস্পরিক সহবস্থানের নিরিখে তৈরি হয় যে পরিমণ্ডল, তাকেই সমাজ বলে। নিজেকে সুষ্ঠভাবে বাঁচিয়ে রাখার চাহিদাতেই মানুষ পারস্পরিক নির্ভরশীল। তাই, আদানপ্রদান, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতেই সহবস্থান করে জীবন নির্বাহ করতে বাধ্য হয়। যে বিজ্ঞান সামাজিক যাবতীয় সম্পর্ক নিয়ে আলোকপাত করে, তাই হল সমাজবিজ্ঞান, এই সমাজবিজ্ঞানকেই সমাজতত্ত্ব হিসাবে পরিগণিত করা হয়। Maclever বলেছেন 'Society is the marvellously intricate and ever changing pattern of the totality of these relationships.'

১৮৩৭ সালে অগাস্ট কোঁৎ তাঁর 'Positive Philosophy' বইতে, 'Sociology' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। এই সমাজতত্ত্বে, ব্যক্তি-ব্যক্তি এবং ব্যক্তি-গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সর্ম্পক নির্ধারণ করে। কোঁৎ এই সমাজতত্ত্ব শব্দটি তৈরি করেছিলেন, গ্রীক শব্দ 'Societus' যার অর্থ সমাজ ও ল্যাটিন

শব্দ ‘Logo’ যার অর্থ বিজ্ঞান। সুতরাং বলা যায় ‘Sociology’ কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল সমাজের বিজ্ঞান (Science of Society)। তবে আধুনিক অর্থে ‘Socious’ শব্দটির অর্থ ভিন্ন ভাবে ধরা হয়, তা হল ‘companionship’ অর্থাৎ ‘sociology is the science of companionship’।

‘Indian Council of social science and Research’ এদের মতে সমাজবিজ্ঞান হল কতকগুলি সামাজিক উপাদান, যেমন— অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্ব, শিল্পের সমাজতত্ত্ব, জ্ঞানের সমাজতত্ত্ব, শিক্ষার সমাজতত্ত্ব ইত্যাদির সমন্বিত রূপ।

N.L. Word এর মতে, ‘Sociology is the science of society and social phenomenon of the progress’ (সমাজবিজ্ঞান হল সমাজের বিজ্ঞান এবং অগ্রগতির সামাজিক প্রেক্ষাপট)

Hob House এর মতে ‘মানব মনের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াই হল সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু।’ (The subject matter of sociology is the Interaction of human mind’)

Mac Iver এবং Page-এর মতে ‘সমাজবিজ্ঞান হল সামাজিক সম্পর্কের আলোচনা’। (Sociology is the study of the social relationship)

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে সমাজবিজ্ঞান হল কতকগুলি নির্বাচিত আচার-আচরণ। পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, মানব গোষ্ঠীর বিভিন্ন কার্যাবলি এবং বিকাশ কাঠামোর একটি সুসংগঠিত আলোচনা, অর্থাৎ বলা যায়, ‘Sociology is the systematic study of the development structure and the function of human groups, conceive as process of interaction or as organised pattern of collective Behaviour.’

১.৩ সমাজতত্ত্বের অর্থ ও ধারণা (Meaning and Concept of Sociology)

প্রথম পর্যায়ে সমাজতত্ত্বকে ‘সামাজিক দর্শন’ বা ‘ইতিহাসের দর্শন’ হিসাবে চিহ্নিত করা হত। উনবিংশশতাব্দী থেকে সমাজতত্ত্ব স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ফরাসী মনীষী অগাস্ত কোঁৎ (Auguste Comte) ১৮৩৯ সালে ‘সমাজতত্ত্ব’ নামকরণটি করেন ইংরেজি ‘sociology’ শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে লাতিন শব্দ ‘societus’ যার অর্থ হল সমাজ (society) এবং গ্রীকশব্দ ‘Logos’ যার অর্থ হল অধ্যয়ণ বা বিজ্ঞান (Study or Science) থেকে। সুতরাং সমাজতত্ত্বের বুৎপত্তিগত অর্থ হল সমাজের বিজ্ঞান (Science of Society) যা পরিবার থেকে রাষ্ট্র প্রভৃতি সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিচার বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করে। সমাজ ও সামাজিক সম্পর্কের বিস্তারিত আলোচনাও সমাজতত্ত্বের অন্যতম লক্ষ্য। Ross বলেছেন ‘Individuality is of no value and personality a meaningless term apart from social environment in which they are developed and made manifest.’ ব্যক্তি তার সামাজিক পরিবেশ যেখানে সে বড় হয়েছে এবং তার কার্যকলাপের ক্ষেত্র তা থেকে বিছিন্ন হয়ে পরে। একক ব্যক্তিত্ব দিয়ে কখনও কোন সমাজ গঠিত হতে পারে না, এবং একক

ব্যক্তিত্ব সমাজ সেই ব্যক্তির একক অস্তিত্বের কোন অর্থ হয় না।

বিভিন্ন দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। সমাজতত্ত্বকে যেমন সমাজের বিজ্ঞান বলা হয়, সেই সাথে তাকে সমাজের বিভিন্ন সম্পর্কগুলির বা উপদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের অধ্যায়নও বলা হয়। তাই বিভিন্ন সমাজতত্ত্বাবিদ বিভিন্নভাবে সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা দিয়েছেন। সমাজতত্ত্বকে জানতে গেলে প্রথমে তার সংজ্ঞা জানা জরুরী হয়ে পরে।

সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা (Definition of Sociology)

According to Auguste Comte, 'Sociology is the science of social phenomena subject to natural and invariable laws, the discovery of which is the object of investigation.' আবার ডুর্কহেইম (Emile Durkheim) সেই জায়গায় বলেছেন 'Sociology is the science of social institutions', ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) মনে করতেন সামাজিক কার্যাবলীর অধ্যয়ন হল সমাজতত্ত্ব, 'sociology is the study of human interactions and interrelations their conditions and consequences', কুলারের (J. F. Culler) মতে, 'sociology may be defined as the body of scientific knowledge about human relationship, Gillin and Gillin এর মতে, 'Sociology in its broadest sense may be said to be the study of interactions arising from the association of living beings.

বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ বিভিন্নভাবে সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা দিয়েছেন। এককভাবে কোন সংজ্ঞাই সমাজতত্ত্বের সামগ্রিক দিককে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। তবে সমস্ত সংজ্ঞা একত্রে সমাজতত্ত্বের সামগ্রিক রুপকে ফুটিয়ে তোলে। আসলে সমাজ জীবনের ছবিই হল সমাজতত্ত্ব। সমাজতত্ত্বের উপজীব্য, বিষয় হল সামাজিকতা (Socialness) এবং সামাজিক সম্পর্ক (social relationship), যদিও, Maclver 'মানবিক সম্পর্কের আলোচনাকেই' সমাজতত্ত্ব বলে অভিহিত করেছেন। মানবিক সম্পর্কের ভিত্তি হল বিভিন্ন সামাজিক কার্যাবলীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ। এই সামাজিক সম্পর্ক ও কার্যাবলীর অভিন্ন অংশ মানুষ বলে, মানুষকে সামাজিক জীব বলা হয়। সুতরাং সমাজতত্ত্ব বলতে সমাজগত সম্পর্কের বিজ্ঞানকে বলা হয়।

১.৪ সমাজতত্ত্বের প্রকৃতি (Nature of Sociology)

সমাজতত্ত্ব হল জ্ঞানচর্চার একটি স্বতন্ত্রধারা। স্বভাবতই সমাজতত্ত্বের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। মানব সভ্যতা এবং সামাজিক জীবন সমাজ ছাড়া অচল। প্রত্যন্ত একটি ব-দ্বীপে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে কোন মানুযের জীবনধারণ করা এককথায় অসম্ভব। জীবনের যে স্তরে বা সমাজে যে উচ্চতায় থাকি না কেন, যত বৈচিত্র্যময় আমাদের জীবন হোক না কেন, সব কিছুর উপরে আমরা মানুষ। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহায়তা দিয়ে আমাদের জীবনের কাঠামো তৈরি হয়। আমরা প্রত্যেকে একটা সুনির্দিষ্ট সামাজিক

পরিবেশে এবং সুনির্দিষ্ট সংস্কৃতিও কৃষ্টির মধ্যে বড় হয়ে উঠেছি, সেই সমাজের সব বৈশিষ্ট্য ও কৃষ্টি আত্মঃ করণের মাধ্যমে আজ আমরা মানুষ এবং সমাজের অভেদ্য অচ্ছেদ্য অংশ।

শুধু সভ্যতা, পরিবেশ, সংস্কৃতি নয়, মানুষের বাঁচার জন্য পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এক বিশাল ভূমিকা পালন করে। কিন্তু মানুষ শুধু খাদ্যের উপর বেঁচে থাকে না, পারস্পরিক সম্পর্কও বেঁচে থাকার রসদ জোগায়। পশুর জীবন শুধুমাত্র দৈহিক চাহিদা ও ক্ষুধা নিবৃত্তির পুরণে পূর্ণ হলেও, মানুষের জীবনে ওটা সামগ্রিকতা নয়। সে তার চিন্তন, কার্যাবলী এবং জ্ঞানের মাধ্যমে নিজের ছাপ এই পৃথিবীতে ছেড়ে যায়। এই ছাপ ছেড়ে যাওয়ার বাসনার গুরুত্ব দৈহিক চাহিদার থেকে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই বাসনায় তাঁকে উপলব্ধি করতে সহায্যে করায় অনেকের মধ্যে সে ও তাদেরই একজন। আর এই উপলব্ধি সমাজ তৈরিতে বিশাল ভূমিকা পালন করছে। সেই সাথে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক সমুহ, সামাজিক কার্যকলাপ, বিভিন্ন ধরণের গোষ্ঠী, বিভিন্ন প্রকারের জন সম্প্রদায়, ব্যক্তিত্ব, বংশগতি, সংঘ এবং সমিতি প্রভৃতি। এর সাথে জন্ম নিয়েছে, বিভিন্ন নিয়মাবলী, প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি সংঘর্ষ, গোষ্ঠী সংঘর্ষ, মতবিরোধ অনেক সময় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম তৈরি করে যা সামাজিক অস্তিত্বকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়। তবুও মানুষ একসাথে বাঁচে, একসাথে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে। সমাজতত্ত্ব সাধরণত মানুষের জীবন ও মানুষের মিথষ্ক্রিয়ার কথা বলে। মানুষের সাধারণ কার্যকলাপের মাধ্যমেই সে সমাজে নিজেকে প্রকাশ করে। উদাহরণ হিসাবে ধরা যায়, নেকড়ের মা নেকড়ে সন্তানের জন্মের পরই তাকে চরম বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে তাকে বড় করে তোলে, তাই সে পশু। যদি কোন মা তার সদ্যোজাতকে ওই নেকড়ে শিশুর মত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মানুষ করে তেলে, সেও পশু হিসাবে তৈরি হয়। তার মধ্যে ঠিক-ভুল, ভালো মন্দ প্রভৃতি কোন মূল্যবোধ দেখা যায় না। তার মধ্যে সামাজিকতা, সাংস্কৃতিক মনস্কতা কোন কিছুই দেখা যায় না।

সমাজ বলতে বোঝায় সংঘবন্ধ, একদল মানুষ যা তাদের ধারণা, অনুভূতি ও কর্মের বিনিময়ে পারস্পরিক সম্পর্ককে আবদ্ধ করে। সমাজ মানুষের সামাজিকতার ধারণাকে বিকশিত ও প্রকাশিত করে তোলে। শুধুমাত্র প্রাথমিক চাহিদার জন্য সে সমাজে বসবাস করে না, তার আত্মপ্রকাশের জন্য ও সমাজে অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্যক্তি তার অস্তিত্ব ও কল্যাণের জন্য সমাজের উপর নির্ভরশীল। সমাজের অগ্রগতির সাথে সাথে ব্যক্তিরও অগ্রগতি ঘটে। সহযোগিতার সম্পর্কের মধ্যেই সে বেঁচে থাকে। কেন মানুষ এইভাবে অভিব্যক্তি জ্ঞাপন করে? কেন মানুষ সামাজিক ব্যক্তি গোষ্ঠী তৈরি করে? কি কারণে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি? কেন পূজা এবং প্রার্থনা একই সমাজে চলে? কেন বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ও স্থানের মধ্যে বিভিন্নতা আছে? কিভাবে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ও সাহায্যের পরিবর্তন হয়? কেন কিছু মানুষ সমাজ বিরোধী কার্য্যে লিপ্ত হয়? আদিম অবস্থা থেকেই মানুষ কোন না কোন একধরনের সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বসবাস করে আসছে। সমাজের বাইরে ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব অসম্ভব। আর সমাজতত্ত্ব আমাদের চারপাশে ঘটনা সমূহ কেন ঘটছে, কেন ক্রিয়ার জন্য এই ধরনের

প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে তার সামগ্রিক রূপ?

১.৫ সমাজতত্ত্বের পরিধি (Scope of Sociology)

শুরুর সময় থেকেই, Comte, Marx, Spencer, Giddins, Durkhei, Weber প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী সমাজতত্ত্বকে একটি আকার দেবার চেষ্ট করে এসেছেন। সমাজতত্ত্ব বলতে সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞানকেই বলা হয়। এই কারণে হবহাউস বলেছেন, সমগ্র সমাজ জীবনই সমাজতত্ত্বের আলোচ্যবস্তু। সমাজতত্ত্বের আলোচনা ক্ষেত্রের পরিধি ও বিষয়বস্তু নিয়ে মতপার্থক্যের শেষ নেই। তাই এক্ষেত্রে কোন একটি মত সর্বজন গ্রাহ্য বলে বিবেচনা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে বিদ্যাভূষণ ও সচদেব বলেছেন, 'It is maintained by some that sociology studies everything and anything under the sun'.

Giddens বলেছেন 'Sociology is very broad and diverse subject and any simple generalizations about it as a whole are questionable', বস্তুত সমাজতত্ত্বের সঠিক বিষয়বস্তু কী এবং এই শাস্ত্রটির আলোচনা ক্ষেত্রের সীমরেখা কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত এই বিষয়ে সমাজতত্ত্ববিদদের আলোচনার মধ্যে ঐক্যমত সুদূরপরাহত। তবে C Gibldens এর দেওয়া সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা অনেকাংশে সর্বজন গ্রাহ্য। অর্থনীতি, ইতিহাস, মনোবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ নৃতত্ত্ববিদ্যার সম্মিলিত শাখা সমাজ বিজ্ঞানের জন্ম দেয়। সমাজবিজ্ঞানে কি পড়নো হয় এর থেকেও কিভাবে পড়ানো হয়, কোন কোন বিষয়বস্তু এর আলোচনা ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে, সেটাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ।

এবার সমাজবিজ্ঞানের পরিধি প্রসঙ্গে আসা থাক। V.H. Calberton লিখেছেন, 'Since sociology is as elastic as a science, it is difficult to determine just where its boundaries begin and end, where sociology becomes social psychology and where social psychology becomes sociology, or where economic theory becomes sociological doctrine or biological theory becomes sociological theory, something, which is impossible to decide.'

প্রকৃত বাস্তবে, সমাজতত্ত্বের আলোচনা ক্ষেত্রের পরিধি সম্পর্কিত এ রকম অভিমত নিতান্তই অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর সমাজতত্ত্বের নিজস্ব ও নির্দিষ্ট আলোচনাক্ষেত্র অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের থেকে আলাদা। সমাজতত্ত্ব নিজের পরিধির মধ্যে সেইসব বিষয় ও সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করে, যেগুলি অন্য সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়।

সমাজজীবনের একটি সামগ্রিক ছবি হল সমাজতত্ত্ব, ব্যক্তি ও সমাজ একই মুদ্রার দুই পিঠ। সমাজসৃষ্টি হয় মানুষের সাথে মানুষের সংযোগ, সহাবস্থান ও সহযোগিতার ফলে। Fichte বলেছেন, 'Man becomes man only among men.' শুধুমাত্র সহজাত প্রবৃত্তির ফলশ্রুতির প্রভাবে নয়, প্রয়োজনের তাগিদেও মানুষ সমাজবদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। মানুষের সবপ্রকার কার্যকলাপ সংগঠিত হয় সমাজের মধ্যে। বেঁচে থাকার লড়াই থেকে শুরু করে সামাজিক অনুশাসনের প্রতি দায়বদ্ধতা, মূল্যবোধ,

নিজের সংস্কৃতির প্রতি দায়িত্বশীলতাএবং চরিত্র গঠন সবকিছুই সমাজতত্ত্বের অভিন্ন বিচরণক্ষেত্র।

কিন্তু এত বড় ক্ষেত্রকে আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আনা ও তাকে কার্যকরকরা খুবই দুরহ কাজ। সেইজন্য নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা খুব প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দুই ধরনের মতামত পরিলক্ষত হয়।

একদল বলেন, সমাজতত্ত্বের মূল বিষয় হল মানবসমাজের বেশ কিছু বিষয় নিয়ে বিশ্লেষাত্মক আলোচনা। এবং তাঁদের মতানুসারে, সমাজতত্ত্বের আলোচনাক্ষেত্র সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের বহুবিধ পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখা এবং সেই সম্পর্কের তাৎপর্য বিশ্লেষণের মাধ্যই সীমাবদ্ধ। জার্মান সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞানী সিমেলের (Simmel) এর মতে সামাজিক সম্পর্কের বিশেষ কয়েকটি দিক নিয়ে সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু হওয়া উচিত। তাঁর মতে সমাজতন্ত্র হল স্বতান্ত্রিক এবং বিশেষ ধরনের এক সামাজিক বিজ্ঞান। অন্য মতবাদে, সমাজতত্ত্বকে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান সমূহেরসমন্বিত একটি রূপ হিসাবে প্রতিপন্নকরার কথা বলা হয়। করণ সামাজিক কার্যকলাপ বহুমুখী, অর্থনীতি, রাজনীতি, নৃতত্ত্ব বা ইতিহাস বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানের সাথে সমাজতত্ত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। বিদ্যাভূষণ ও সচদেবের অভিমতানুসারে 'The synthetic school wants to make sociology a synthesis of the social sciences or a general science', এই মতবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে ডুর্কাহেইসহবহ-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

১.৬ সারসংক্ষেপ

স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে আত্মপ্রকাশের সময় থেকে সমাজতত্ত্ব মানুষ, মানবসমাজ ও মানবসমাজের গতিশীলতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এসেছে। সমাজতত্ত্বে মানুষকে এককব্যাক্তি হিসাবে বিবেচনা না করে তাকে মানবসমাজের একক রূপে চিহ্নিত করে তার গতিশীলতার উপর আলোকপাত করা হয়। সমাজতত্ত্ব সমাজের গতিশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপন করে, সেই সাথে মূলত তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে ১) কীরূপে সমাজের সৃষ্টি ২) সমাজে কেন ও কিভাবে টিকে আছে এবং ৩) সমাজের পরিবর্তন ও গতিশীলতার কারণ কি ও কিভাবে কেন তা পরিবর্তিত হচ্ছে।

১.৭ স্বমূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-Assessment Questions)

১. সমাজতত্ত্ব কি?

২. অন্যান্য বিজ্ঞান থেকে সমাজবিজ্ঞান কোন পরিপ্রেক্ষিতে ও কিভাবে আলাদা?

৩. সমাজতত্ত্বের পরিধি কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যমান?

৪. সমাজতত্ত্বের জনক কে?

৫. সমাজতত্ত্বের প্রকৃতি বলতে কি বোঝ?

১.৮ অভিসম্বন্ধ (**Reference**)

Agarwal, J. C (2002) Theory and Principles of Education (13th ed.) New Delhi-Vikash Publishing House.

Bhatia, K & Bhatia, B. D (1992) Theory and Principles of Education (20th Ed) Delhi; Doaba House.

Bhattacharya, D. C (1996). Sociology (6th ed.) Cacutta Vijoya Publishing House.

Pandey, R.S (2009) Principals of Education (13th Ed) Agra-2, Agrawal Publications.

Ravi. S. S (2015) A comprehensive sudy of Education (2nd Ed.) Delhi; PHI Learning Sharma, Y. K. (2016) Foundation in Sociology of Education, Delhi; Kaniska Publishers.

Saxena. N.R.S (2009) Principles of Education Meerut; Vinay Rakhija.

একক ২ ❑ শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ ভূমিকা

২.৩ শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব

২.৪ সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষার প্রকৃতি

২.৫ সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষার পরিধি

২.৬ সারসংক্ষেপ

২.৭ স্বমূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

২.৮ অভিসম্বন্ধ (Reference)

২.১ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায় পড়ার পর, ছাত্রছাত্রীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবগত হবেন।

- শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা গড়ে তুলবেন।
- শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বর লক্ষ্যগুলি সম্বন্ধে অবগত হবেন।
- শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতাত্ত্বর প্রভাব সম্বন্ধে অবগত হবেন।

২.২ ভূমিকা

শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব হল ব্যক্তি ও তার সাংস্কৃতিক পরিবেশে মধ্যে যে সম্পর্ক, তা যেভাবে সংগঠিত হয় তার শিক্ষাশাস্ত্রই হল শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব। শিক্ষা সূত্রে যে জ্ঞান লাভ করে, সমাজে বসবাসকারী মানুষ সেই প্রাপ্ত জ্ঞান পথেই আচরণ করে, নিজের সহজাত আবেগ, প্রবণতা বা প্রেরণাকে সমাজ উপযুক্ত ভাবে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, এইভাবেই শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের মাধ্যমে শিক্ষা-সমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করে।

২.৩ শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব (Sociology of Education)

প্রতিটি সমাজের তার নিজস্ব কাঠামো অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট কিছু সামাজিক সাংস্কৃতিক চাহিদা থাকে। শিক্ষার দ্বারাই তা একমাত্র পূরণ করা সম্ভব। বর্তমান পৃথিবীতে অকুলান প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশের অবক্ষয়, ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। শিক্ষার কাজ হল সেই সমস্ত চাহিদা, সমস্যাকে অতিক্রম করা ও মানবসভ্যতাকে

অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়া। শুধু তাই নয়, সময়ের সাথে সাথে সমাজেরও পরিবর্তন হয়, নতুন কিছু সংযোজিত হয় এবং পুরোনো কিছু সভ্যতার আঙিনায় ঝড়ে পরে। শিক্ষা সতত এবং সর্বদা সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের দিক পরিবর্তন করে। এক সার্থক সমাজব্যবস্থা সমাজতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এই পর্বে সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে—

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ একত্রে কাজ করে সমাজকে সমৃদ্ধ করে, এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং সমাজের সার্বিক উন্নতি করার জন্য।

- সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পাঠক্রম গড়ে তোলা।
- সমাজের বিভিন্ন উপাদান বিদ্যালয় ও সমাজের উপর ক্রিয়া করে।
- সামাজিক উপাদানগুলি ব্যক্তিমানসকে দায়িত্বশীল মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে।
- শিক্ষার উদ্দেশ্য দায়িত্বশীল মানুষ গড়ে তোলা। গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা ও দায়িত্ব তাদের মধ্যে সঞ্চার করে শিক্ষা গণতান্ত্রিক কাঠামোকে সুনির্দিষ্ট করে এবং রক্ষা করে। দেশভেদে গণতান্ত্রিক কাঠামো ভিন্ন হওয়ায় দেশে ভেদে শিক্ষার পাঠক্রমেও বিভিন্নতা দেখা যায়।
- বিশ্বায়নের ফলে শিক্ষার গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তজার্তিক সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সাথে ব্যক্তির সুদৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করার ক্ষেত্রে শিক্ষার জুড়ি মেলাভার।
- বিশৃঙ্খল সমাজে অগ্রগতি কখনও সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি সমাজে কিছু নিয়মনীতি, শৃঙ্খলা, রীতিনীতি থাকে। শিক্ষার মাধ্যমে সে আগামী প্রজন্মের মনে ও মননে প্রোথিত করে এবং সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করে।
- সবার সাথে মানিয়ে চলায় সামাজিক দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। এবং শিক্ষা শিশুকে সর্বক্ষেত্রে সমাজের সাথে মানিয়ে চলার মন্ত্র শেখায়।
- বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রভাব ব্যক্তিমানসের মধ্যে বর্তমান থাকে।

২.৪ সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষার প্রকৃতি (Nature of Sociology of Education)

সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষা কেবল সামাজিক কাঠামো ও সম্পর্কের মধ্যে অন্তর্নিহিত জটিলতাগুলির ধারণা প্রদান করে না, বরং এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তা, ন্যায়বিচার এবং সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে। সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষা সমাজের গঠন, বৈশিষ্ট্য, এবং কার্যক্রমের প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি করে, যা শিক্ষার্থীদের একটি অবিচলিত, ন্যায়সঙ্গত, এবং মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে সহায়ক হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম যা শিক্ষার্থীদেরকে তাদের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে এবং সমাজে পরিবর্তন আনার জন্য কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুত করে।

এছাড়া, সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষার প্রকৃতি মানবাধিকার, সমানাধিকার, সামাজিক ন্যায়, এবং অন্যান্য মৌলিক মানবিক মূল্যবোধের প্রতি গভীর মনোযোগ দেয়। এটি শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দেয় কিভাবে বৈষম্য, দারিদ্র্য, লিঙ্গবৈষম্য, জাতিগত বৈষম্য, এবং সামাজিক অস্থিরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায়। শিক্ষার্থীরা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সম্পর্ক এবং ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক চাহিদার প্রতি সহানুভূতি ও সম্মান জানাতে শিখে, যার ফলে তারা একে অপরকে সহায়তা করতে এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়।

সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদেরকে তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা এবং তাদেরকে একটি সুস্থ, সমৃদ্ধ, এবং উন্নত সমাজ গড়ে তোলার জন্য প্রেরণা প্রদান করা। এটি সামাজিক দায়িত্বশীলতা এবং নাগরিক সচেতনতা গড়ে তোলার পাশাপাশি, শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ ও শৃঙ্খলা তৈরি করে। এমনকি, সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সৃজনশীল চিন্তা এবং সমাধান প্রস্তাব করার ক্ষমতা তৈরি করে, যা তাদের ভবিষ্যত পেশাগত এবং সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সমাজের প্রতিটি স্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার ফলস্বরূপ সমাজে সম্ভাব্য উন্নতির জন্য তাদের ভাবনা এবং পদক্ষেপ তৈরি করে। সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষা সমাজের মৌলিক কাঠামোকে বুঝতে সাহায্য করে এবং তাদের শিক্ষাকে শুধুমাত্র পঠনপাঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, তাদের বাস্তব জীবনে অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ করতে সমর্থিত করে তোলে।

২.৫ সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষার পরিধি (Scope of Sociology of Education)

সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষার পরিধি হল—

- এই শিক্ষা সাধারণত সমাজ, সমাজের রীতিনীতি, গোষ্ঠী, শ্রেণী, পরিবেশ, সামাজিকরণ প্রক্রিয়া দুই বা ততোধিক ভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির মিলন, সাংস্কৃতিক ব্যবধান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করে।
- সমাজতত্ত্ব শিক্ষা অন্যান্য বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যস্থ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে যেমন সামাজিক শ্রেণী, স্তর, বিভিন্ন সামাজিক প্রভাব, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম, শিক্ষা, শিক্ষার পাঠক্রম ইত্যাদি।
- সমাজ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ভৌগোলিক অবস্থান ও জাতিগত প্রেক্ষাপট। ভৌগোলিক অবস্থান ও জাতিগত প্রেক্ষাপট। ভৌগোলিক অবস্থান ও জাতিগত প্রেক্ষাপট দুটিই নির্দিষ্ট জনবসতির সমাজজীবন ও শিক্ষাকে প্রভাবিত করে, যেমন গ্রামাঞ্চল, শহরাঞ্চল বা উপজাতি প্রসুত বসতি ইত্যাদি।

- কোন একটি শ্রেণিকক্ষ কখনও সমস্বত্ত শিক্ষার্থী দ্বারা তৈরি হয় না। বিভিন্ন বুদ্ধিমত্তার ও বিভিন্ন সামাজিক স্তরের শিক্ষার্থীরা সেখান থাকে। সুতরাং বিভিন্ন শিক্ষাদান প্রণালী সেখানে প্রয়োগ করা হয়, তাদের সামগ্রিক উন্নতির জন্য।
- সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রদানকারী সংস্থা আছে, যেমন— IBN, ICSE, SSC ইত্যাদি মধ্যে পাঠক্রম ও বিষয়বস্তুর পার্থক্য দেওয়া, সমাজতত্ত্বশ্রয়ী শিক্ষার অন্য একটি প্রধান কাজ হল, কোন সংস্থা সবথেকে উপযুক্ত মানবসম্পদ তৈরি করে তা দেখা।
- সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল মানব সমাজের বিভিন্ন সংস্থার যেমন, পরিবার, বিদ্যালয়ের কেমন প্রভাব শিক্ষার্থীদের জীবনে পরে তা আলোচনাকরা।
- শুধু তাই, বিদ্যালয় সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়, সভ্যতা, সংস্কৃতি থেকে শিক্ষার্থী সেখানে আসে মানবসম্পদে রূপান্তরিত হবার জন্য, বিদ্যালয়ের গঠন, সহপাঠী গোষ্ঠীর বিশেষ প্রভাব শিক্ষার্থী জীবনে লক্ষ্য করা যায়, যা শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে।
- শিক্ষার শুরু হয় শিশুর বাড়ি থেকে। তার পরিবেশ, তার পঠন পাঠনের উপর শিশুর অভিভাবকের পড়াশুনার প্রভাব, পরিবারের অর্থ-সামাজিক প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজতত্ত্বশ্রয়ী শিক্ষা শিশু শিক্ষার সাথে উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলির প্রভাব আলোচনা করে।
- সমাজতত্ত্বশিক্ষাশ্রয়ী চিন্তা-চেতনা, মনোভঙ্গি, ন্যায়নীতি প্রভৃতি ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চার করে সামাজিক নীতি, আচার আচরণ, বর্ণবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, লিঙ্গ বৈষম্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়াই করার চেতনা তৈরি করে।

২.৬ সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষার গুরুত্ব, লক্ষ্য এবং প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যা সমাজের কাঠামো, সম্পর্ক এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে। এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তা, ন্যায়বিচার ও সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে এবং তাদেরকে সমাজের বৈষম্য, দারিদ্র্য, লিঙ্গবৈষম্য ও জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করে। সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষা শ্রেণী, গোষ্ঠী এবং সামাজিক সংস্কৃতির মতো উপাদানগুলির উপর আলোকপাত করে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। এটি শিক্ষার্থীদের সমাজের সমস্যার সমাধানে সৃজনশীল চিন্তা ও কার্যকর সমাধান প্রস্তাব করার ক্ষমতা তৈরি করে, যা তাদের ভবিষ্যতের পেশাগত ও সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২.৭ স্বমূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

১. শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব কী? এর মৌলিক ধারণাগুলি কী কী?

২. সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষার বিভিন্ন প্রভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিন।

৪. সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন কোন সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা যায়?

৫. সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষার প্রকৃতি এবং এর মৌলিক দিকগুলি কী কী?

৬. সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষার পরিধি নিয়ে আলোচনা করুন।

৭. শিক্ষার প্রক্রিয়ায় সমাজের বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব কিভাবে কাজ করে?

৮. সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষা সমাজের কোন কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত?

৯. স্কুলের পরিবেশ এবং সহপাঠী গোষ্ঠী শিশুর চরিত্র গঠনে কিভাবে প্রভাব ফেলে?

১০. সামাজিক বৈষম্য এবং নৈতিকতা সংক্রান্ত কোন ধারণাগুলি সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত থাকে?

২.৮ অভিসম্বন্ধ (Reference)

Agarwal, J. C (2002) Theory and Principles of Education (13th ed.) New Delhi; Vikash Publishing House.

Bhatia, K & Bhatia, B. D (1992) Theory and Principles of Education (20th Ed.) Delhi; Doaba House.

Bhattacharya, D. C (1996). Sociology (6th ed.) Cacutta Vijoya Publishing House.

Pandey, R.S (2009). Principals of Education (13th Ed.) Agra-2, Agrawal Publications.

Ravi, S. S (2015) A comprehensive study of Education (2nd Ed.) Delhi; PHI Learning Sharma, Y. K. (2016) Foundation in Sociology of Education, Delhi; Kaniska Publishers.

Saxena, N.R.S (2009) Principles of Education Meerut; Vinay Rakhija.

একক ৩ ❑ শিক্ষা ও সমাজ (Education and Society)

৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৩.২ ভূমিকা (Introduction)

৩.৩ শিক্ষা ও সমাজ (Education and Society)

৩.৪ সামাজিক সংস্থা (Social Institutions)

৩.৫ সমাজ ও শিক্ষার মধ্যে সংযোগ (Society and Education Linkages)

৩.৬ সারসংক্ষেপ

৩.৭ স্বমূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

৩.৮ অভিসম্বন্ধ (Reference)

৩.১ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর, শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবগত হবেন।

- সমাজ ও শিক্ষা কিভাবে সর্ম্পকিত সে বিষয়ে অবগত হবেন।
- সমাজের গতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা সর্ম্পকে ধারণা লাভ করবেন।
- সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করবেন।

৩.২ ভূমিকা

শিক্ষা মানুষের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে সমাজ উপযোগী ও সময় উপযোগী করে তোলে। শিক্ষার লক্ষ্যই হল সমাজের সাথে সঙ্গতি বিধানের মাধ্যমে উন্নত সামাজিক জীবনচর্চার নীতি উদ্ভাবন ও কৌশল বিধান। সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত অনুসারে শিক্ষা সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক জীবনধারার বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এবং এই ভূমিকা পালনের মধ্যেই শিক্ষার সঠিক তাৎপর্য নিহিত আছে।

৩.৩. সমাজ ও শিক্ষা (Education and Society)

সমাজ ও শিক্ষা একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। শিক্ষা হলো সমাজের মৌলিক উপাদান, যা ব্যক্তির জ্ঞান, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ এবং দক্ষতা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার সমাজই শিক্ষার কাঠামো, পাঠ্যক্রম ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। তাই কেউ ভাবেন শিক্ষা ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব নেই,

অবার কেউ বা প্রাধান্য দেন সমাজকে, শিক্ষা প্রচলিত হবার বহু আগেথেকে সমাজের অস্তিত্ব ছিল। এই প্রসঙ্গে বলা ভালো, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল দেশের তথা সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী মানবসম্পদ সৃজন, সংরক্ষণ ও পরিবর্তন করা। সুতরাং, শিক্ষা হল সেই সময়কালের সমাজের প্রতিচ্ছবি এবং শিক্ষা সমাজের পরিবর্তন অনুযায়ী নিজেকে পরিবর্তন করে। সুতরাং, সবকিছুর আগে সমাজ এবং সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। তর্কের বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, সমাজ ও শিক্ষা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। সমাজপরিবর্তন ও সমাজ প্রগতির পথ প্রদর্শক হল শিক্ষা, শিক্ষার প্রভাবে মানুষ দেশের সম্পদে পরিণত হবে। বর্তমান সমাজজীবনে শিক্ষা জনসাধারনকে জাতীয় আদর্শের অনুগামী করে তুলছে। সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষা, ব্যক্তিমানব একটি উৎকৃষ্ট জীবনযাপনের উপযোগী করে তোলে এবং ব্যক্তিমানস বানানোর মাধ্যমে সমাজকেও উপযুক্তমানবসম্পদ সরবরাহ করা হয়। শিক্ষার মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় সামাজিক জীবন যাত্রার রীতি পদ্ধতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কৃষ্টি এক প্রজন্ম থেকে অর এক প্রজন্মে সঞ্চালিত হচ্ছে। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার অন্যতম মাধ্যম হল শিক্ষা।

সমাজ পারস্পরিক সম্পর্কের এক জটিল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গঠিত হয়, যেখানে এই সম্পর্কগুলিই মূলভিত্তি হিসেবে কাজ করে। মানুষের আচরণ ও বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর বিকাশ এসব সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল। প্রতিদিনের জীবনে আমরা নানা ধরনের সম্পর্কের সঙ্গে পরিচিত হই পরিবার, গোষ্ঠী এবং বৃহত্তর সমাজের মধ্যে এসম্পর্কের অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

পরিবারে বাবা-মা, সন্তান, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী প্রভৃতি প্রাথমিক সম্পর্কের সঙ্গে আমরা যেমন যুক্ত, তেমনি সমাজেও বিভিন্ন ধরণের সম্পর্কের অস্তিত্ব অনুভব করি। এই সম্পর্কগুলোই সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি তৈরি করে এবং সমাজের স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতিকে নিশ্চিত করে। সেই সাথে বিভিন্ন গৌণ সম্পর্ক যেমন কাকা, জ্যেঠা, কাকাতুতো, মাসতুতো এইসব সম্পর্কের অস্তিত্ব আছে। এছাড়াও তোমাদের জীবনে তৃতীয় আপেক্ষিক সম্পর্ক যেমন বন্ধু, প্রতিবেশী এই ধরনের বহু সম্পর্কের অস্তিত্ব বোঝা যায় আমাদের জীবনে তাদের স্থান ও তাদের প্রভাবের উপর ভিত্তি করে। একজন শিক্ষক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেন। তিনি পড়ান, খাতা দেখেন, গোষ্ঠীবদ্ধভাবে শ্রেণিকক্ষে কাজ করেন, আবার বিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজকর্মে সাহায্যে করেন। সেই সাথে সেই শিক্ষক পরিবারের বিভিন্ন কাজে পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধশীল থাকেন এবং একইসাথে সমাজের প্রতিও। সুতরাং বলা যায়, প্রত্যহিক জীবনে একজন ব্যক্তি বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেন। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক একজন ব্যক্তি তারসন্তানের জন্য পিতার ভূমিকা পালন করেন, আবার একইসাথে তিনি তার পিতামাতার সন্তান, ও স্ত্রীর কাছে স্বামী অবার তাঁর ভাইবোনের কাছে দাদা অথবা ভাই, হয়ত শিক্ষক তার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য, এইরকম না জানি কত ভূমিকায় একজন ব্যক্তি অবতীর্ণ হন। ব্যক্তিমানবের ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্র যেখানে যেমন, সেখানে তেমন তার ভূমিকা পালন করে। এবংবিভিন্ন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনশীল। প্রত্যেকটা ভূমিকা (role) একটা সামজিক অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত থাকে, যাকে পদমর্যাদা বা Social Status বলা হয়। এই সামাজিক পদমর্যাদা (Social Status) সামাজিক কিছু নিয়মাবলী ও নৈতিকতাবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। সামাজিক নিয়মাবলী

ও নৈতিকতা এবং আদর্শ সমাজের অলিখিত সংবিলনিক কাঠামো। গোষ্ঠীজীবনে একদিকে সেইগুলি যেমন ঐক্য ও সংহতির সৃষ্টি করে, তেমনি অপরদিকে বিচ্ছিন্নতাবোধ ও স্বাতন্ত্র্যবোধের সঞ্চার করে। সুতরাং গোষ্ঠীর স্বরূপ, তার নিয়মনীতি, শৃঙ্খলা, আদর্শ হল সেই সমাজের ধারক ও বাহক।

Society (সমাজ) শব্দটি Latin শব্দ 'Societies' থেকে উদ্ভূত যার অর্থ বন্ধু এবং মিত্র। এই শব্দটি ব্যবহার হয় বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক ও কথোপকথন বোঝাতে। বিভিন্ন সমাজ চিন্তক, সমাজ নৃতত্ত্ববিদ এবং অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন 'সমাজ কী' বোঝাতে। তার মধ্যে দুটি মতবাদ বহুল প্রচলিত, যা সমাজকে প্রবাহমান রাখে। প্রথম হল 'Social action' এবং অন্যটা হল 'social interaction'. আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ ম্যাকলিভার ও পেজের মতে 'Society as a system of usage and procedures, of authority and mutual aid, of many grouping and divisions of controls of human behaviours and of liberties,' তাই, সমাজকে আমরা দেখতে পারি পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে, যেখানে সবাই একই ঐতিহ্য কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং একই পদ্ধতিতে জীবনধারণ করে। কিন্তু এর ব্যবহার শুধুমাত্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং গোষ্ঠীভেদে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু গোষ্ঠী ও সমাজ এক নয়। সমাজ হল বৃহৎ বিমূর্ত ধারণা যেখানে গোষ্ঠী তার একটি ক্ষুদ্র অংশ। আমেরিকান সমাজতত্ত্বাবিদ Talcott Parsons, সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক ব্যবস্থার কথা বলছেন এবং সেখানে 'Interaction' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 'Interaction' কে তিনি মানুষের ব্যবহারের কারণ হিসাবে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে কোন কার্য সামাজিক হয় না যতক্ষণ না সেখানে বহু মানুষের অংশদারিত্ব থাকে। প্রত্যেকে সমাজের অংশ হওয়ায়, প্রত্যেক বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে সমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে। সুতরাং সমাজকে জানতে গেলে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিশদে জ্ঞান থাকা উচিত। শুধু তাই নয়, সমন্বয়, সংহতি ও শৃঙ্খলাছাড় কোন সমাজ ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না। সামাজিক ব্যবস্থা কিছু মূল্যবোধক কিছু রীতিনীতি, প্রথ, অসর বিধিকে প্রাধন্য দেয় যা মানব সমাজকে ঐক্যবন্ধ ও সুসংহত করে রেখেছে।

৩.৪ সামাজিক সংস্থা (Social Institutions)

সামাজিক সংস্থাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান গুলি হল—পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধার্মিক প্রতিষ্ঠান, অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক ক্ষেত্রে এই সমস্ত সংস্থাগুলি বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে সমাজকে সুসংহত রাখতে ও অগ্রগতির পথে প্রসারিত করতে। এই অধ্যায়েই সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যাবলী নিয়ে বিশদে নিম্নে আলোচনা করা হবে।

১. পরিবার (Family)

সামাজিকীকরণের প্রথম প্রতিষ্ঠান হলে পরিবার, পরিবারই শিশু ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠনের ভূমিকা পালন করে এবং পিতা-মাতা কারিগর হিসাবে কাজ করেন। শিশুর জীবনে শিক্ষকের ভূমিকায় উপনীত হন পিতা-মাতা এবং অন্যান্য পারিবারিক সদস্য। এই শিক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে

আমাদের মধ্যে যেসব গুণাবলী গড়ে ওঠে তার অধিকাংশের ভিত্তি আমাদের পিতা-মাতা, পরিবার থেকেই একটি শিশুর আচার-আচরণ, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করে, সমাজের বুকে একজন যোগ্য ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সভ্যতার শুরু থেকেই পরিবার সামাজিকরণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পরিবার গোষ্ঠী ও সমাজের মধ্যে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে চলেছে যেটা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে। পরিবার বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে শিশুকে সামাজিকরণের পাশাপাশি, যেমন- বিবাহ, নাম, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা, অস্তিত্ব সংরক্ষণ, সন্তানের জন্ম দেওয়া, সন্তানের যত্ন নেওয়া, সুশীল নাগরিক হিসাবে সন্তানকে লালন পালন, অর্থনীতির ক্ষুদ্রতম অংশ হিসাবে অর্থনীতিকে সচল রাখাপ্রভৃতি। সমাজ ভেদে পরিবারের আকারে ও কর্মসম্পাদনায় বিভিন্নতা দেখা গেলেও পরিবার সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিবার বিবাহ ও আত্মীয়তা নামক প্রতিষ্ঠানগুলির পথে তার সম্পর্ক সম্পাদনা করে।

২. ধর্ম (Religion)

ধর্ম ও এমন একটি প্রতিষ্ঠান সভ্যতার আদিকালথেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সমান গুরুত্বে ও মর্যাদায় নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে, Durkheim বলেছেন 'If, religion has given birth to all that is essential in society, it is because the idea of is the soul or religion.' তিনি বলেছেন ধর্ম একটি সমন্বিত ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে বিশ্বাস ও অভ্যাস একটা বড় ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কাল মার্কস, তিনি ধর্মকে আফিম বলেছেন, যা হৃদয়হীন সমাজের নির্দশন বহন করে, সমাজ ব্যবস্থায়, ধর্মের সব থেকে শক্তিশালী ভূমিকা হল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।

৩. অর্থনীতি (Economy)

অর্থনীতি সমাজ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। প্রত্যেক সমাজের নির্দিষ্ট রূপরেখা থাকে। উৎপাদন, বিতরণ ও খরচের মধ্যে সেই রূপরেখাই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠমেকে সুনির্দিষ্ট করে। যে কোন সমাজ উন্নয়ন কোন অবস্থায় আছে তা নিশ্চিত হয়, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও তার প্রয়োজনীয়তার মধ্য দিয়ে। কাল মার্ক মনে করতেন, অর্থনীতি সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি তৈরি করে যার উপর ভিত্তি করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলি দাঁড়িয়ে থাকে।

৪. শিক্ষা (Education)

সমাজ ব্যবস্থাকে সচল রাখতে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। যদিও সমাজভেদে এর বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। মূলত সব ধরনের সমাজ ব্যবস্থায়, শিক্ষা প্রানত ত্রুটি ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়, যা সমাজভেদে অভিন্ন। সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে সামাজিক করে তোলা এবং সমাজে সংস্কৃতির সঞ্চালনের বাহনরূপে নিজের ভুমিকা সুনিশ্চিত করা। দ্বিতীয়তঃ মানুষকে মানবসম্পদ হিসাবে গড়ে তোলা। বিভিন্ন সামাজিকীকরণ সংস্থা যেমন পরিবার, গোষ্ঠী, সহপাঠীদলের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও শিক্ষা সমাজের বিচলন (Social mobility) প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানপ্রদানের

মাধ্যমে আন্তঃস্তরবিচলনে (intergenerational mobility) সাহায্য করে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষার সমান অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যা সমাজে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণিকে উল্লম্বী সামাজিক বিচলনে সাহায্য করে। সমাজ পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। শিশুর মধ্যে সৃজনশীলতা ও সমাজে বেঁচে থাকর গুরুত্বপূর্ণ রসদ শিক্ষার দ্বারা সঞ্চারিত হয়।

৬. রাজনীতি / রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান (Polity)

প্রতিটি সমাজের সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়মনীতি, মূল্যবোধ বর্তমান থাকে। রাজনীতিক ব্যবস্থা ও কাঠামো আইন প্রয়োগ করে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ও জীবনে সেইসব নিয়ম ও মূল্যবোধের সংরক্ষণ করে। বটোমারের (T. B. Bottomore) এর মতে রাজনীতির কাজ হল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিতরণ করা সমাজের প্রত্যেকস্তরে রাজনীতির উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক বির্বতনের সাথে সাথে রাজনীতি নিজেকেও অভিযোজিত করেছে, সমাজ ও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। রাজনীতিক কাঠামো ও ব্যবস্থার উপর সমাজিক ও জীবনধরাগত বিভিন্ন বিষয়ের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

সমাজ চলে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে। বিদ্যালয় ও সমাজ সতত পরিবর্তনশীল, পারস্পরিক নির্ভরশীল সম্পর্কের মাধ্যমে শিক্ষার উপর সমাজতত্ত্বের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। Dewey বলেছেন, 'We are apt to look at the school from an individualistic stand-point as something between teacher and pupil or between teacher and parent'. যদি সমাজকে গঠনতন্ত্রের দিক থেকে ভাগ করা যায়, পরিবার, শিক্ষা, ধর্ম, অর্থনীতি এবং রাজনীতি তার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

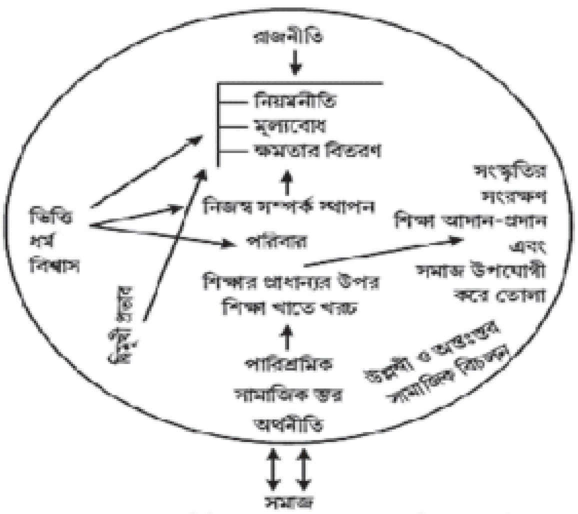

সমাজ ও তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

৩.৫ সমাজ ও শিক্ষার মধ্যে সংযোগ (Society and Education Linkages)

শিক্ষার দ্বারা শিশুর সামাজিকীকরণ সম্ভব। সামাজিকীকরণ হল আত্মসক্রিয়তা এবং অভিযোজনের এক পদ্ধতি যারা দ্বারা শিশুর সামাজিক বিকাশ হয়। শিশুর সামাজিক ও পরিপূর্ণ বিকাশ দ্বারাই সমাজের অগ্রগতি ও বিকাশ সম্ভব। শিশুর সেই বিকাশের জন্য সমাজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। ডুর্কহেইম্সের মতে, একটি বিশেষ সমাজের উন্নত নাগরিক হয়ে ওঠাই ব্যক্তিজীনের প্রধান উদ্দেশ্য, যার সহায়ক প্রক্রিয়া হল শিক্ষা, শুধু তাই নয়, তিনি আরও বলেছেন, যদি পরিবার শিশুর মধ্যে সামাজিকসংস্কৃতি, রীতিনীতি, মূল্যবোধের প্রাথমিক বীজ বপন করতেও অসমর্থ হয়। শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক দায়িত্ব এটাই শিশুর মধ্যে তা সঞ্চার করা, জন ডিউই বিদ্যালয় ও সমাজের নিবিড় যোগাযোগের কথা বলেন, তিনি বলেছেন, বিদ্যালয় সমাজের ক্ষুদ্র সংস্ককরণ। জন ভিউই তাঁর বিখ্যাত দুটি বই ‘School and Society (1899)’, ‘Democracy and Education (1916) সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষার গুরুত্বের উপর নিবিড়ভাবে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে স্কুল ও শিক্ষণ প্রণালীর মূল লক্ষ্য হল সমাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা। টলস্টয় থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গান্ধীজি সবাই এককথায় স্বীকার করেছেন, সামাজিক পরিকাঠামোয় শিক্ষার অপরিহার্যতা।

a) সংস্কৃতির সঞ্চালন (Transmission of Culture)

এই পৃথিবী মানুষই তৈরি করেছে। যেকোন সংস্কৃতির প্রাথমিক উপলক্ষ্য হল মানুষ সৃষ্ট এই সংস্কৃতি কৃষ্টি সংরক্ষণ করা এবং সাথে সাথে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে তা বয়ে নিয়ে চলা। অন্যান্য জীব থেকে মানুষের তফাৎ এই সভ্যতা সংস্কৃতিই নির্দেশ করে দেয়। প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব কিছু সংস্কৃতি কৃষ্টি থাকে যা তারা সংরক্ষণ করে ও পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে বপন ও সঞ্চালনের মাধমে তার অস্তিত্ব বজায় রাখে। সুতরাং, শিক্ষা ও সমাজের মধ্যে এই সংস্কৃতিই সংযোগ রক্ষা করে চলেছে ও তাদের সন্নিবদ্ধ করে রাখে। মানব সমাজের সবকিছুই সংস্কৃতির পরিধির মধ্যে পড়ে। তোমার নিশ্চয় উৎসুকতা তৈরি হচ্ছে সংস্কৃতি কি এবং সমাজ ও শিক্ষর সাথে এর সম্পর্ক কি? টেলর (L.B. Tylor) একজন ব্রিটিশ নৃতত্ত্বাবিদ, তিনি বলেছেন সংস্কৃতি হল ‘a complex whole which includes knowledge, belief, art, law, morals customs and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society’, গোড়া থেকেই, প্রত্যেক সমাজের নিজেস্ব রীতিনীতি সংস্কৃতি, কৃষ্টি আছে, যা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে বিভিন্ন সামজিক সংস্থা যেমন পরিবার, গোষ্ঠী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানিক সংস্থার মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়।

b) সমাজে অসমতা ও অসামপ্ততা দূরীকরণ (Reduce Inequality and Disparity)

শিক্ষা আমাদের মধ্যে জ্ঞানের স্যার ঘটায় আর সেই অর্জিত জ্ঞান পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী অস্ত্র।

শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে সমাজে স্থিতিশীলতা ও স্থায়িত্ব তৈরিতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'In finding the solution to our problem, we shall have helped to solve the world problem as well... If India can offer to the world her solution, it will be a contribution to humanity.' যদিও শিক্ষা জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে এবং আর্থিকভাবে সাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করে, কিন্তু প্রাচীন ভারতের শিক্ষার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল না, না সেখানে শিক্ষা ক্ষেত্রে সমসুযোগের কেন ছবি দেখা যেত। শিক্ষার সুযোগ উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় ও সমাজ ব্যবস্থ্ উচ্চ শ্রেণীর হাতে সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য দেখা যেত। ইংরোপীয় আদলে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরিই হয়েছিল একদল অভিজাত শ্রেণী তৈরি করা যারা ব্রিটিশ সরকারের রথে ঢাকা নিজেদের কাঁধে রেখে সমাজের অগ্রগতির পথে টেনে নিয়ে যেতে পারে। স্বাধীনতা পরবর্তীযুগে, সংবিধান (Article 21-A & 45) প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার দরজা সর্ব সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, সমাজের বঞ্চিত শ্রেণী, পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় শিক্ষকে অস্ত্র করে সামাজিক স্তরে এগিয়ে এসেছে। UN Millennium Development Goal (2000) যে অটখানা লক্ষ্য দিয়েছে তার মধ্যে দুখানা হল বিশ্বের সবাই যেন প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া এবং দ্বিতীয়তঃ লিঙ্গ সমতার পরিবেশ তৈরি করা। বিশ্বের ১৮৯টা দেশ এই লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে, তার মধ্যে ভারতও একটি। এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে সর্বশিক্ষা অভিযানের সূচনা করা হয়েছে। সেই সাথে নারী শিক্ষার প্রগতির জন্য মহিলা সংঘ (Mahila Sankhya), কস্তুরবাগান্ধী বালিকা বিদ্যালয় (Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya KGBV) আঞ্চলিক ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা, বৈষম্য একমাত্র শিক্ষা দ্বারাই দূর করা সম্ভব, তাই প্রাথমিক অগ্রগতির শিকড় হচ্ছে শিক্ষা এবং এর সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি।

c) সমাজের বিচলন ও সমাজের পরিবর্তন (Social Mobility and Social Change)

শিক্ষা সামাজিক জীবনে সব থেকে প্রভাবশালী শক্তি হিসাবে কজ, যা মানুষকে উন্নতর আর্থ সামাজিক স্তরে গমন করতে সাহায্য করে। শিক্ষা সমাজিক বিচলন ও সেই সাথে সামাজিক পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। সামাজিক স্তর বিভাজন (Social Stratification) মানুষের সমাজ জীবনের শুরু থেকেই বিদ্যমান। ব্যক্তির বা ব্যক্তি সমষ্টির স্তরবিন্যাসের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে স্থান পরিবর্তনকেই বলা হয় সামাজিক বিচলন (Social Mobility)। শিশু ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সামাজিক বিচলনের ক্ষেত্রে মোক্ষম ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন সেই পথের দিশারী। সুতরাং বলা যায়, সামাজিক বিচলন আরও একধরনের সমাজতত্ত্বের জন্ম দিয়েছে যা 'Anticipartory Socialization' নামে পরিচিত। সামাজিক বিচলনের ফলে যখন কোন ব্যক্তি উন্নতর সামাজিক স্তরে বিরাজ করে, তখন জন্মলগ্নে পাওয়া সেই সামাজিক স্তরের সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কার ভুলে, সামাজিক বিচলনের ফলে প্রাপ্ত স্তরের সংস্কৃতি পালন করে বা করার চেষ্টা করে।

d) নতুন জ্ঞানের বিকাশ (Development of New Knowledge)

জীবনে অগ্রগতি ও সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি জ্ঞানার্জন যা কেবলমাত্র শিক্ষার দ্বারা সম্ভব। সমাজ সতত পরিবর্তনশীল সমাজ ও শিক্ষা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার রূপের ও কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। কখনও নতুন জ্ঞান সংযোজিত হয়, কখন বা বর্তমান জ্ঞানের সাথে নতুন উপাদান মিশিয়ে তাকে সময় উপযোগী করে তোলা হয়। আমরা জানি, প্রয়োজনীয়তা, উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয় রসদ জোগায়। সভ্যতার আদিলগ্ন থেকে বর্তমান কালের আধুনিক সভ্যতার রূপরেখা নির্ধারিত হয়েছে বিভিন্ন নতুন আবিষ্কার আর নতুন সম্পদের মধ্য দিয়ে। প্রথমলগ্নে পাওয়া ধাতুর ধারণা, আগুন আর চাকার আবিষ্কার সভ্যতার অগ্রগতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলো। এই আবিষ্কারগুলিই খাদ্য সংগ্রহকারী মানুষ থেকে খাদ্য উৎপাদনকারী মানুষে পরিণত করেছিল। সভ্যতার পাতা জুড়ে এইরকম শত শত উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। সম্প্রতিকালে ইন্টারনেট সংযোজন, সংযোগ মাধ্যমের বিপ্লব সমগ্র পৃথিবীকে সার্বজনীন গ্রামে (Global Village) পরিণত করেছে।

সার্বিক উন্নতির চাবিকাঠি হল শিক্ষা। শিক্ষায় ছাত্রকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দক্ষ করে তোলে, সুস্থশরীর, মন এবং সামাজিক মনে ভাবাপন্ন ব্যক্তিত্ব সারা পৃথিবীকে তার কর্মক্ষেত্র বানাতে পারে। দুর্বল শিক্ষাব্যবস্থা সমাজের অগ্রগতিকে বন্ধ করে দিতে পারে।

সুতরাং, বলা যায়, শিক্ষারব্যবস্থা সমাজের প্রতিটি দিক ও প্রতিটি কোণকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথাগত সংস্থা (Formal Education), বিধিমুক্ত সংস্থা (Informal Education) এবং অপ্রথাগত শিক্ষা (Non-Formal Education) সবই শিক্ষার আধার, সময় ও কালের প্রকারভেদের জন্য যাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। সভ্যতার শুরু থেকে অপ্রথাগত শিক্ষার অস্তিত্ব। প্রথাগত ও বিধিমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা পরবর্তীকালের সংযোজন, বিধিমুক্ত শিক্ষা হল প্রথাগত শিক্ষা প্রক্রিয়ার বইারে কোন শিক্ষা, শিখন বা প্রশিক্ষণ-এর ফলে শিক্ষার্থীর শিখনসক্ষমতা বাড়ে এবং জীবনব্যাপী শিক্ষাকে সম্ভবপর করে তোলে।

৩.৪ সারসংক্ষেপ

কোন নবজাতককে পুরোপুরি কোন সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শিক্ষার্থী শিক্ষার সাহায্যেই নিজের সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং নিজ নিজ সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরূপে পরিগণিত হয়। শিক্ষার মাধ্যমেই ব্যক্তিকে সমাজ উপযোগী গড়ে তোলার জন্য তার মনোজগতের ও আচরণের পরিবর্তন করা হয়। ফলে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের আচার-আচরণ-আর্দশ বা জীবনধারা সমাজের সমষ্টিগত ঐতিহ্য ও আর্দশের অনুগামী হয়ে থাকে।

৩.৫ স্বমূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-Assessment Questions)

১. সংস্কৃতি, রীতিনীতি কিভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে?

২. শিক্ষার মাধ্যমে সংস্কৃতির সঞ্চালন কিভাবে হয়?

৩. সমাজে অমমতা ও অসামঞ্জ্যতা দূরীকরণে শিক্ষার ভূমিকা সম্বন্ধে লেখ।

৪. সমাজ ও শিক্ষা দিভাবে পরস্পরের সাথে সর্মকিত?

৩.৮ অভিসম্বন্ধ (Reference)

Agarwal, J. C (2002) Theory and Principles of Education (13th ed.) New Delhi; Vikash Publishing House.

Bhatia, K & Bhatia, B. D (1992) Theory and Principles of Education (20th Ed.) Delhi; Doaba House.

Bhattacharya, D. C (1996). Sociology (6th ed.) Cacutta Vijoya Publishing House.

Pandey, R.S (2009). Principals of Education (13th Ed.) Agra-2, Agrawal Publications.

Ravi, S. S (2015) A comprehensive study of Education (2nd Ed.) Delhi; PHI Learning Sharma, Y. K. (2016) Foundation in Sociology of Education, Delhi; Kaniska Publishers.

Saxena, N.R.S (2009) Principles of Education Meerut; Vinay Rakhija.

পর্যায় ২

সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিত

Perspectives on Sociology of Education

একক ৪ ❑ শিক্ষাশ্রয়ী সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি (Sociology as the Foundation of Educational Studies)

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ ভূমিকা

৪.৩ শিক্ষাশ্রয়ী সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি

৪.৪ সারসংক্ষেপ

৪.৫ স্বমূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

৪.৬ অভিসম্বন্ধ (Reference)

৪.১ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর, ছাত্রছাত্রীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সেম্বন্ধে অবগত হবেন—

- শিক্ষাশ্রয়ী সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি কি?

৪.২ ভূমিকা

আধুনিক শিক্ষাকে সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষার সাথে সমাজের যে সম্পর্ক আছে এবং তা যেভাবে শিক্ষাকে প্রভাবিত করে সেটাই সমাজতত্ত্ব শিক্ষার ভিত্তিরূপে পরিগণিত করা হয়। একেই বলা হয় শিক্ষাশ্রয়ী সমাজবিজ্ঞান। এটি হল শিক্ষাবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মিলিত রূপ।

৪.৩ শিক্ষাশ্রয়ী সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি শিক্ষা অধ্যয়নের ভিত্তি হিসাবে সমাজবিজ্ঞান

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা অধ্যয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, কারণ এটি শিক্ষা ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিকগুলোকে বিশ্লেষণ করে এবং শিক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের উন্নতি ও পরিবর্তনকে কীভাবে প্রভাবিত করা যায় তা বোঝার চেষ্টা করে।

১. সামাজিক কাঠামো ও শিক্ষা

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সমাজের কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত করে দেখে। এটি সমাজের বিভিন্ন

শ্রেণী, জাতি, লিঙ্গ, এবং সামাজিক বৈষম্যের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে এবং কিভাবে শিক্ষা এই বৈষম্যকে মোকাবিলা করতে পারে তা বুঝতে সাহায্য করে। শিক্ষা কেবল জ্ঞান অর্জন নয়, এটি সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

২. সামাজিকীকরণ ও শিক্ষা

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ঘটে, যার মাধ্যমে তারা সমাজের নিয়ম, মূল্যবোধ, এবং আচরণ শিখে। স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজের আদর্শ, আচরণ ও সামাজিক নিয়ম শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে। এটি শিক্ষার্থীদের সামাজিক ভূমিকা, দায়িত্ব এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

৩. শিক্ষা এবং সামাজিক পরিবর্তন

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা প্রক্রিয়ায় সমাজ পরিবর্তনের গুরুত্ব বোঝায়। সমাজের প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন শিক্ষা ব্যবস্থার উপর প্রভাব ফেলে এবং শিক্ষা সমাজের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে। এটি সমাজের মধ্যে বৈষম্য দূর করতে এবং সমাজে সামগ্রিক উন্নতি ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৪. বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও শিক্ষা

বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে শিক্ষা সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নতি সাধন করে, যা শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে তৈরি করতে সহায়তা করে।

৫. শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা হয়, যা তাদের সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং গণতান্ত্রিক সচেতনতা তৈরি করে। এটি শিক্ষার্থীদের মানবাধিকার, সমানাধিকার, এবং সামাজিক ন্যায় সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, যাতে তারা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়।

৭. শিক্ষা ও সমাজের সম্পর্ক

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার মূল ভিত্তি হল শিক্ষা ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কের গভীর বিশ্লেষণ। এটি শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক কাঠামো এবং সমাজের কাঠামোগত বৈষম্য বিশ্লেষণ করে, এবং শিক্ষার মাধ্যমেই কীভাবে এই বৈষম্য কমানো যায় তা নিয়ে চিন্তা করে। শিক্ষার সামাজিক প্রভাব পর্যালোচনা করে সমাজের প্রতিটি স্তরের পরিবর্তন আনতে সহায়তা করা সম্ভব হয়। এটি শুধুমাত্র এক একটি জনগণের জীবনকে উন্নত করে না, বরং বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোর উন্নতিতেও ভূমিকা রাখে।

৮. শিক্ষা ও সামাজিকীকরণ

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা বিশেষভাবে সামাজিকীকরণের ধারণাকে প্রাধাণ্য দেয়। শিক্ষা একটি প্রক্রিয়া যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজে কিভাবে নিজেকে অভিযোজন এবং সমন্বিত হতে হবে তা শেখায়। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে প্রবেশের মাধ্যমে একটি সাংস্কৃতিক সমাজের অংশ হয়ে ওঠে, যেখানে তারা সমাজের মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, আইন এবং নিয়ম শিখে। এই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে সমাজের সক্রিয় সদস্য হিসেবে ভূমিকা পালন করতে সহায়ক হয়।

৯. শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা, সমাজের কাঠামো ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা তৈরি করে। এটি শিক্ষাকে একটি শক্তিশালী সামাজিক পরিবর্তনকারী শক্তি হিসেবে দেখায়, যেখানে সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষ সমান সুযোগ এবং অধিকার পেতে পারে। শিক্ষা সমাজের বৈষম্য দূর করতে, লিঙ্গভিত্তিক সমতা, জাতিগত সংহতি এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় এবং সুসংহত হয়।

১০. শিক্ষা এবং সামাজিক ন্যায়

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা, সামাজিক ন্যায় এবং অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে সহায়ক। এটি শিক্ষার্থীদের মানবাধিকার, সমানাধিকার এবং ন্যায়বিচার সম্পর্কিত ধারণা শেখায়, যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে সামাজিক দায়িত্বশীলতা গড়ে তোলে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য যেমন— জাতিগত, ধর্মীয়, লিঙ্গভিত্তিক, অর্থনৈতিক বৈষম্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে উঠতে পারে, যা সমাজের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়।

১১. বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট এবং শিক্ষা

বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা গুরুত্ব বাড়িয়েছে। সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার ভূমিকা বোঝায়। এটি শিক্ষার্থীদেরকে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে তৈরি করতে সহায়তা করে, যাতে তারা বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে মেলবন্ধন স্থাপন করতে পারে এবং বৈশ্বিক সমস্যাগুলির সমাধান করতে সচেষ্ট হয়।

১২. শিক্ষা ও সমাজের শৃঙ্খলা

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এটি শিক্ষার্থীদের সামাজিক আচরণ, নিয়ম-নীতি এবং শৃঙ্খলা শেখায়, যা সমাজের শান্তিপূর্ণ এবং সুসংহত কার্যক্রমে সহায়ক। সমাজের নানা উপাদান যেমন— পরিবার, ধর্ম, সরকার, অর্থনীতি ইত্যাদি শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণ এবং মনোভাবের ওপর প্রভাব ফেলে, যা সমাজের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং উন্নতিতে সহায়ক।

১৩. সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা ও শিক্ষা

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা অর্জন করে, যা তাদের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করে। সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনা তাদেরকে সমাজের কাঠামো এবং বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে সহায়তা করে এবং ভবিষ্যতে তারা এই জ্ঞান ব্যবহার করে সমাজে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়।

১৪. শিক্ষা ও সামাজিক শ্রেণী

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, গোষ্ঠী এবং জাতিগত বৈষম্য নিয়ে আলোচনা করে। এটি শিক্ষার্থীদেরকে সমাজের শোষণ, বৈষম্য এবং শ্রেণীভেদ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে কীভাবে এই বৈষম্য দূর করা সম্ভব তা আলোচনা করে। শিক্ষা, শ্রেণীভেদ ও অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে এবং শিক্ষাকে কীভাবে সমাজের সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজে লাগানো যেতে পারে তা দেখায়।

১৫. সামাজিক দায়িত্বশীলতা এবং নাগরিক শিক্ষা

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্বশীলতা এবং নাগরিক সচেতনতা তৈরি করে। এটি শিক্ষার্থীদের মানবাধিকার, গণতন্ত্র, আইন এবং ন্যায়বিচার সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা তাদের অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় এবং তারা সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। এটি তাদেরকে আরও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।

১৬. শিক্ষা ও সংস্কৃতি

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সামাজিক মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত। এটি শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সমাজের অন্যান্য সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে শেখায়। সমাজের বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় এবং ঐক্যের ধারণা শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবর্তিত হয়, যা ভবিষ্যতে তাদেরকে বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে কার্যকর ভূমিকা পালনে সহায়ক হয়।

১৭. শিক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তন

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা, সমাজের পরিবর্তন ও উন্নতির জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব বোঝায়। সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে, যেমন- দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য ইত্যাদি, শিক্ষাকে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সমাজের সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জগুলো বুঝতে পারে এবং সেগুলির সমাধানে কিভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে তা শিখে।

১৮. সামাজিক নীতি এবং শিক্ষা

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা, সামাজিক নীতির গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তোলে। এটি সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক ন্যায় এবং সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা বোঝায়। সামাজিক নীতি, আইন এবং নৈতিক আচরণের বিষয়ে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একটি উন্নত, শান্তিপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে অংশ নিতে পারে।

১৯. বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট এবং শিক্ষা

বিশ্বায়নের যুগে, সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ এবং বিশ্ব সমাজের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি শিক্ষার্থীদেরকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুত্ব, বৈশ্বিক সমস্যাগুলির সমাধান এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক মেলবন্ধন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বোঝায়। বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা শিক্ষার্থীদেরকে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে তৈরি করতে সহায়তা করে, যারা পৃথিবীজুড়ে শান্তি, সমতা এবং উন্নতির জন্য কাজ করবে।

২০. সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা ও ব্যক্তিগত বিকাশ

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্বের গুণাবলী, সামাজিক দক্ষতা এবং মানসিক স্থিতিশীলতা তৈরি করে। এটি তাদের ব্যক্তিগত বিকাশে সহায়ক হয় এবং তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ার, দায়িত্বশীলতা, সমালোচনামূলক চিন্তা এবং মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীরা কেবল শিক্ষাগত দক্ষতা অর্জন না করে, বরং ব্যক্তিগত এবং সামাজিক দক্ষতাও অর্জন করে, যা তাদের পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবনে সহায়ক হয়।

৪.৪ সারসংক্ষেপ

শিক্ষাশ্রয়ী সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তির নিরিখে আছে শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক আগ্রহ। শিক্ষাবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান একে অপরকে প্রবাবিত করে, কিভাবে পারস্পরিক, মেলবন্ধনের মাধ্যমে সমাজ এগিয়ে চলে, তারই পথপ্রদর্শক। তাই সমাজবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন চিন্তাধারার সার্থক মূর্তি হল সমাজবিজ্ঞান।

৪.৫ স্বমূল্যায়ন প্রশ্নাবলী

১. সমাজতত্ত্ব ও পাঠক্রম কিভাবে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত?

২. সমাজতত্ত্ব শিক্ষা পদ্ধতিকে কিভাবে প্রভাবিত কবে?

৩. Willard Waller কিভাবে শিক্ষাকে সামাজিক প্রণালী বলে ব্যাখা করেছেন?

৪. বিদ্যালয় কি সামাজিক প্রতিষ্ঠান? ব্যাখ্যা কর।

৪.৬ অভিসম্বন্ধ (Reference)

Agarwal, J. C (2002) Theory and Principles of Education (13th ed.) New Delhi; Vikash Publishing House.

Bhatia, K & Bhatia, B. D (1992) Theory and Principles of Education (20th Ed.) Delhi; Doaba House.

Bhattacharya, D. C (1996). Sociology (6th ed.) Cacutta Vijoya Publishing House.

Pandey, R.S (2009). Principals of Education (13th Ed.) Agra-2, Agrawal Publications.

Ravi, S. S (2015) A comprehensive study of Education (2nd Ed.) Delhi; PHI Learning Sharma, Y. K. (2016) Foundation in Sociology of Education, Delhi; Kaniska Publishers.

Saxena, N.R.S (2009) Principles of Education Meerut; Vinay Rakhija.

অধ্যায় ৫ ❑ সামাজিকতার ধারণা

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ ভূমিকা

৫.৩ সামাজিকতার ধারণা

৫.৪ সামাজিক সুসঙ্গতি

৫.৫ সামাজিক অসমতা

৫.৬ সামাজিক সমতা ও শিক্ষার ভূমিকা

৫.৭ সারসংক্ষেপ

৫.৪ স্বমূল্যায়ন প্রশ্নাবলী

৫.৯ অভিসম্বন্ধ (Reference)

৫.১ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর, ছাত্রছাত্রীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবগত হবেন—

- সামাজিকতা সম্বন্ধে আলোকপাত
- সামাজিক সুসঙ্গতি ও তার ভূমিকা
- সামাজিক অসমতা কি
- সামাজিক সমতা রূপায়ণে শিক্ষার ভূমিকা

৫.২ ভূমিকা

মানুষ সামাজিক প্রাণী, সামাজিকীকরণ হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানব শিশু উক্ত সমাজের কাঙ্ক্ষিত পূর্ণাঙ্গ সদস্য হিসাবে গড়ে ওঠে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে। সামাজিকতা হল মানবসমাজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তাঁর মধ্যে যে মানবিক গুণাবলীর প্রকাশ হয় তার মূলে আছে সামাজিক আদান-প্রদান।

এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি সামাজিক সুসঙ্গতি, সামাজিক অসমতা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা কি এবং সামাজিক সমতা রক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা সম্বন্ধে। মানুষের আচার-ব্যবহারের সবটাই

জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সহজাতপ্রবৃতি নয় বরং তার সামাজিকতার উপর শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ যে প্রভাব আছে তা এই অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৫.৩ সামাজিকতার ধারণা

সামাজিকতা হল মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন, একে অপরকে বুঝতে পারা এবং একটি সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বসবাস করার প্রক্রিয়া। এটি মানব জীবনের অঙ্গীভূত অংশ, যা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং যোগাযোগের মাধ্যমে সমাজে একটি স্থায়ী জায়গা তৈরি করে। সামাজিকতা শুধু সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি আমাদের অভ্যন্তরীণ মানসিকতা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আচরণ, সংস্কৃতি এবং আচার-আচরণের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

সামাজিকতা শৈশব থেকে শুরু হয় এবং জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিকশিত হয়। শিশুরা প্রথমত সামাজিক আচরণ শিখে তার পরিবার থেকে, যেখানে তারা বিভিন্ন নিয়ম-কানুন, মূল্যবোধ এবং আচরণগত শৃঙ্খলা গ্রহণ করে। পরবর্তীতে স্কুল, বন্ধু-বান্ধব, এবং পেশাগত জীবনেও সামাজিকতা শেখা যায়। এটি মানুষকে তার পরিবেশ এবং সমাজের সাথে সংযুক্ত করে, যেমন— কাজের জায়গায় সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক তৈরি, সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া ইত্যাদি।

সামাজিকতার প্রক্রিয়া একটি সাংস্কৃতিক ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব নিয়ম, মূল্যবোধ এবং আচরণ রয়েছে যা তাদের সদস্যরা শিখে এবং তা অনুসরণ করে। এই প্রক্রিয়া ব্যক্তির জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে এবং তাকে সমাজের অংশ হিসেবে গড়ে তোলে। সামাজিকতা একটি প্রাকৃতিক প্রবণতা হিসেবে মানুষের মধ্যে নিহিত থাকে, যা তাকে একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে উৎসাহিত করে এবং সামাজিক কাঠামোর মধ্যে একে অপরের সাহায্যে জীবনযাপন করতে সক্ষম করে।

সামাজিকতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মানসিক এবং আবেগিক সম্পর্কের বিকাশ। এটি মানুষের আবেগ ও মনোভাবের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান এবং সহানুভূতির সঞ্চার ঘটায়, যা মানসিক সুস্থতা এবং সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সৃষ্টি করে। সামাজিকতা একজন ব্যক্তিকে তার নিজের সীমানা এবং পরিচিতির বাইরে গিয়ে অন্যদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, সহযোগিতা এবং সমর্থন দেয়ার এক অনন্য সুযোগ প্রদান করে।

অতএব, সামাজিকতা শুধু মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কেরই অঙ্গীভূত অংশ নয়, বরং এটি সমাজের সাংস্কৃতিক, মানসিক এবং শারীরিক অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। একে অপরকে বুঝে, সম্মান জানিয়ে, এবং একে অপরকে সাহায্য করে আমরা একটি সুস্থ এবং সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে পারি। সামাজিকতার মাধ্যমে শুধু ব্যক্তির বিকাশ ঘটে না, বরং পুরো সমাজের মধ্যে শান্তি, সুসঙ্গতি এবং সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫.৪ সামাজিকতার ভূমিকা

সামাজিকতা মানুষের জীবনযাত্রার মৌলিক অংশ। এটি মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। সামাজিকতার মূলত দুটি দিক রয়েছেএকটি হলো অভ্যন্তরীণ এবং অপরটি হলো বাহ্যিক। অভ্যন্তরীণ সামাজিকতার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজেকে সমাজে একত্রিত অনুভব করতে পারে, এবং বাহ্যিক সামাজিকতার মাধ্যমে সে সমাজের সাথে একীভূত হয়ে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক তৈরি করে। সামাজিকতা বিশেষভাবে মানুষকে তার জাতি, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি এবং পারিবারিক পরিচয়ের সাথে একত্রিত করে।

মানুষ সমাজে একাধিক সম্পর্কের মধ্যে অভ্যস্ত হয়, যেমন— বন্ধুত্ব, দাম্পত্য সম্পর্ক, আস্থার সম্পর্ক, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক ইত্যাদি। এই সম্পর্কগুলো একজন ব্যক্তির মানসিক অবস্থা এবং আচার-আচরণকে প্রভাবিত করে। যখন একজন ব্যক্তি সামাজিকতার মাধ্যমে অন্যদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন সে তার আবেগ, বিশ্বাস, সংস্কৃতি, এবং মূল্যবোধ অন্যদের সাথে ভাগ করে নেয়। এই বিষয়গুলো একত্রিত হয়ে সামাজিকতার ভিত্তি তৈরি করে।

৫.৫ সামাজিকতার প্রক্রিয়া

সামাজিকতার প্রক্রিয়া হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে এক ব্যক্তি তার পরিবেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও সামাজিক আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এটি মানসিক, সাংস্কৃতিক এবং শারীরিক গঠনের সাথে সম্পর্কিত, এবং এটি জন্মের পর থেকেই শুরু হয়। সামাজিকতার প্রক্রিয়া অনেক সময় প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার মাধ্যমে শুরু হয় এবং সমাজের অঙ্গীভূত ব্যক্তি হিসেবে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে।

প্রথমত, সামাজিকতার প্রক্রিয়া শৈশবে শুরু হয়, যখন শিশুটি তার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব এবং শিক্ষক থেকে বিভিন্ন ধরনের শৃঙ্খলা, আদর্শ এবং আচরণ শিখে। শিশুটি এভাবে ধীরে ধীরে সমাজের নানান রীতি, প্রথা এবং মূল্যবোধে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তার মা-বাবা বা অভিভাবকরা শিশুটিকে শিখান কিভাবে তাদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখা যায়, যেমন- কিভাবে কথা বলতে হবে, কিভাবে সম্মান দেখাতে হবে এবং কিভাবে একে অপরকে সহায়তা করতে হবে।

এই প্রক্রিয়াটি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও অব্যাহত থাকে। যখন মানুষ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন সে অন্যদের সাথে বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং এই সম্পর্কগুলো তার ব্যক্তি জীবন ও পেশাগত জীবনকে প্রভাবিত করে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি তার সংস্কৃতি, আচার-আচরণ এবং মূল্যবোধের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে এবং সমাজের মধ্যে তার ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত করে।

৫.৬ সামাজিকতার বিভিন্ন দিক

সামাজিকতার নানা দিক রয়েছে, যার মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক হল:

i. **মৌলিক সম্পর্ক:**এটি ব্যক্তির শৈশবকালে তার পরিবারের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে শুরু হয়। একটি পরিবার একজন শিশুকে প্রথমত সামাজিকতা শেখায়, এবং সে এখান থেকে মূল্যবোধ, আচরণ এবং সামাজিক জীবন সম্পর্কে জানে। পরবর্তীতে এই সম্পর্ক বন্ধু-বান্ধব এবং সম্প্রদায় গঠনেও বিস্তৃত হয়।

ii. **মানসিক দিক:** সামাজিকতা মানসিক প্রক্রিয়া হিসেবেও কাজ করে। এটি একজন ব্যক্তির মানসিক বিকাশ এবং সামাজিক আচরণ গঠন করে। সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে আবেগ এবং মনোভাবের বিনিময় ঘটে, যা মানসিক উন্নয়নে সহায়ক। এভাবে, একজন ব্যক্তি তার অনুভূতি, মনোভাব এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থা সমাজের মধ্যে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়।

iii. **সাংস্কৃতিক দিক:** সামাজিকতা সাংস্কৃতিক ধারণাগুলির প্রতিফলন। মানুষ একে অপরের সাথে তাদের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহ্য ভাগ করে নেয়। এর মাধ্যমে মানুষের চিন্তা, ধর্মীয় বিশ্বাস, ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

iv. **সামাজিক কাঠামো:** সামাজিক কাঠামো হচ্ছে মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং এই কাঠামো সমাজের গঠন ও বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কাঠামোতে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও শ্রেণী থাকে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং দায়িত্ব নির্ধারিত থাকে।

৫.৬ সামাজিকতার প্রভাব

সামাজিকতা শুধু একজন ব্যক্তির নয়, বরং একটি সমাজের অগ্রগতি এবং ঐক্যবদ্ধতার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন একজন ব্যক্তি তার সামাজিক জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে, তখন সে সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। সামাজিকতার মাধ্যমে মানুষ তার সমাজের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধ শিখে, যা তাকে ভবিষ্যতে আরও সফল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।

সামাজিকতা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের একটি প্রক্রিয়া নয়, এটি একটি সাংস্কৃতিক, মানসিক এবং শারীরিক বিকাশের মাধ্যমে মানুষের জীবনে সম্পূর্ণতার অর্জন ঘটায়। এটি একজন ব্যক্তির সামাজিক অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি অমূল্য অংশ হিসেবে কাজ করে, যা সমাজের মধ্যে সংহতি ও সহযোগিতা সৃষ্টি করে। সামাজিকতার ধারায় বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক এবং গোষ্ঠী গঠন হয়ে সমাজ একত্রিত হয়, যার মাধ্যমে একে অপরকে সহায়তা এবং সমর্থন প্রদান করা হয়।

৫.৬.১ সামাজিক সুসঙ্গতি

সামাজিক সুসঙ্গতি হলো এমন একটি অবস্থা যেখানে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ব্যক্তি পারস্পরিকসহযোগিতা ও নির্ভরতার মাধ্যমে একসাথে বসবাস করে এবং সামাজিক ঐক্য বজায় রাখে। এটি সামাজিক সংহতির ভিত্তি তৈরি করে এবং সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। সামাজিক সুসঙ্গতি শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই নয়, বরং এটি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া যা সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও বিভেদ দূর করে সামাজিক সংহতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে।

সামাজিক সুসঙ্গতির উপাদান সমূহ

সামাজিক সুসঙ্গতির প্রধান উপাদানগুলো হলো—

১. **পারস্পরিক নির্ভরশীলতা:** সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি ও গোষ্ঠী একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরতা সামাজিক বন্ধনকে শক্তিশালী করে। প্রতিটি ব্যক্তি সমাজের অন্যান্য সদস্যদের উপর নির্ভর করে এবং এই নির্ভরশীলতা সামাজিক বন্ধনকে মজবুত করে।

২. **সহযোগিতা ও সম্প্রীতি:** মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঝোতা সুস্থ সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত। সহযোগিতা ও সম্প্রীতি ছাড়া কোনো সমাজই টিকে থাকতে পারে না। এটি সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত ও বিভেদ দূর করে সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে।

৩. **সাংস্কৃতিক ঐক্য:** সমাজের বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সংহতি সামাজিক সুসঙ্গতির ভিত্তি তৈরি করে। সাংস্কৃতিক ঐক্য সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়াও সহমর্মিতা সৃষ্টি করে।

৪. **সামাজিক মূল্যবোধ ও ন্যায়বিচার:** সমাজে ন্যায়বিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠিত থাকলে মানুষ একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং সামাজিক শান্তি বজায় থাকে। সামাজিক মূল্যবোধও ন্যায়বিচার সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও বিভেদ দূর করে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করে।

৫.৬.২ সামাজিক সুসঙ্গতির গুরুত্ব

সামাজিক সুসঙ্গতির গুরুত্ব অপরিসীম। এটি—

১. **সমাজে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহমর্মিতার সৃষ্টি করে:** সামাজিক সুসঙ্গতি সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহমর্মিতা সৃষ্টি করে। এটি সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও বিভেদ দূর করে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করে।

২. **সংঘাত ও বৈষম্য কমিয়ে সমাজে স্থিতিশীলতা বজায় রাখে:** সামাজিক সুসঙ্গতি সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত ও বৈষম্য কমিয়ে সমাজে স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। এটি সমাজের

বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও বিভেদ দূর করে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করে।

৩. **অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করে:** সামাজিক সুসঙ্গতি অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করে। এটি সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও বিভেদ দূর করে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করে।

৪. **ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তোলে:** সামাজিক সুসঙ্গতি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আস্থাও বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তোলে। এটি সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও বিভেদ দূর করে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করে। সামাজিক সুসঙ্গতি বজায় রাখতে হলে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ন্যায়বিচারের সংস্কৃতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। শিক্ষা সামাজিক সুসঙ্গতি প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান মাধ্যম । শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তার অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

৫.৭ সামাজিক অসমতা

সামাজিক অসমতা বলতে সেই অবস্থাকে বোঝায় যেখানে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পদ, সুযোগ ও সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য থাকে। এটি সামাজিক অবিচার সৃষ্টি করে এবং সমাজের মধ্যে বিভাজন ও বৈষম্য বাড়ায়। সামাজিক অসমতা সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও বিভেদ সৃষ্টি করে এবং সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীল তাকে বিঘ্নিত করে।

৫.৭.১ সামাজিক অসমতার কারণ

সামাজিক অসমতার প্রধান কারণগুলো হলো—

১. **অর্থনৈতিক বৈষম্য:** ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সম্পদ ও আয়ের অসমবণ্টন সামাজিক অসমতার অন্যতম প্রধান কারণ। অর্থনৈতিক বৈষম্য সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও বিভেদ সৃষ্টি করে এবং সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিঘ্নিত করে।

২. **লিঙ্গ বৈষম্য:** নারীদের তুলনায় পুরুষদের বেশি সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সামাজিক অসমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। লিঙ্গবৈষম্য সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও বিভেদ সৃষ্টি করে এবং সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিঘ্নিত করে।

৩. **শিক্ষাগত অসমতা:** শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান থাকলে তা সামাজিক অসমতা তৈরি করে। শিক্ষাগত অসমতা সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও বিভেদ সৃষ্টি করে এবং সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিঘ্নিত করে।

৪. **জাতি ও বর্ণভিত্তিক বৈষম্য:** নির্দিষ্ট জাতি, ধর্ম বা বর্ণের মানুষ সমাজে বৈষম্যের শিকার হলে সামাজিক অসমতা বাড়ে। জাতি ও বর্ণভিত্তিক বৈষম্য সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও বিভেদ সৃষ্টি করে এবং সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীল তাকে বিঘ্নিত করে।

৫. **কর্মসংস্থানের অসমতা:** কর্মসংস্থানের সুযোগের অনুপস্থিতি, মজুরি বৈষম্য এবং নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব সামাজিক অসমতাকে আরও গভীর করে। কর্মসংস্থানের অসমতা সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও বিভেদ সৃষ্টি করে এবং সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিঘ্নিত করে।

৫.৭.২ সামাজিক অসমতার প্রভাব

সামাজিক অসমতা সমাজে বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যেমন—

১. **সমাজে বিভেদ ও সংঘাত সৃষ্টি করে:** সামাজিক অসমতা সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদও সংঘাত সৃষ্টি করে। এটি সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও বিভেদ সৃষ্টি করে এবং সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিঘ্নিত করে।

২. **দারিদ্র্য ও অপরাধ বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়:** সামাজিক অসমতা দারিদ্র্য ও অপরাধ বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটি সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও বিভেদ সৃষ্টি করে এবং সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিঘ্নিত করে।

৩. **ন্যায়বিচারের অভাব তৈরি করে, যা সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিঘ্নিত করে:** সামাজিক অসমতা ন্যায়বিচারের অভাব তৈরি করে, যা সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিঘ্নিত করে। এটি সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও বিভেদ সৃষ্টি করে এবং সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিঘ্নিত করে।

৪. **অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাহত করে:** সামাজিক অসমতা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাহত করে। এটি সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও বিভেদ সৃষ্টি করে এবং সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিঘ্নিত করে।

৫.৮ সামাজিক সমতা ও শিক্ষার ভূমিকা

সামাজিক সমতা হলো এমন একটি অবস্থা যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি সমান অধিকার, সুযোগ ও মর্যাদা পায়, কোনো বৈষম্য বা পক্ষপাত ছাড়াই। এটি একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের মূলভিত্তি। সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন, যেমন শিক্ষার প্রসার, অর্থনৈতিক সমতা, নারী-পুরুষের সমান অধিকার, আইনি সুরক্ষা ও ন্যায়বিচার, এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি।

৫.৮.১ সামাজিক সমতা অর্জনের উপায়

সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন—

১. **শিক্ষার প্রসার:** শিক্ষা মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে জানার সুযোগ দেয়। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষতার অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

২. **অর্থনৈতিক সমতা:** ন্যায্য মজুরি, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং সম্পদের সুষম বণ্টন সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। অর্থনৈতিক সমতা সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও বিভেদ দূর করে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করে।

৩. **নারী-পুরুষের সমান অধিকার:** লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূর করে সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা জরুরি। নারী-পুরুষের সমান অধিকার সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও বিভেদ দূর করে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করে।

৪. **আইনি সুরক্ষা ও ন্যায়বিচার:** সংবিধান ও আইন অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তির ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা দরকার। আইনি সুরক্ষা ও ন্যায়বিচার সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও বিভেদ দূর করে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করে।

৫. **সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি:** বৈষম্য দূর করতে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সামাজিক আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও বিভেদ দূর করে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করে।

৫.৮.২ সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার ভূমিকা

শিক্ষা সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। শিক্ষার মাধ্যমে—

১. **মানুষতার অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে পারে:** শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তার অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। এটি সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও বিভেদ দূর করে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করে।

২. **সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি পায়:** শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি পায়। এটি সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও বিভেদ দূর করে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করে।

৩. **ন্যায়বিচার ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে:** শিক্ষার মাধ্যমে ন্যায়বিচার ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। এটি সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও বিভেদ দূর করে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করে।

৪. **সকল শ্রেণীর মানুষকে একীভূত করার সুযোগ তৈরি হয়:** শিক্ষার মাধ্যমে সকল শ্রেণীর মানুষকে একীভূত করার সুযোগ তৈরি হয়। এটি সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও বিভেদ দূর করে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করে।

৫.৯ সারসংক্ষেপ

সামাজিক সুসঙ্গতি এমন একটি অবস্থা যেখানে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরতার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করে। এটি সামাজিক ঐক্য, সম্প্রীতি, সাংস্কৃতিক সংহতি ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। সামাজিক সুসঙ্গতির প্রধান উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, সহযোগিতা, সাংস্কৃতিক ঐক্য ও সামাজিক মূল্যবোধ। এটি সমাজে স্থিতিশীলতা বজায় রাখে, সংঘাত কমায় এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করে। তবে সামাজিক অসমতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ, যা অর্থনৈতিক বৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য, শিক্ষাগত ও কর্মসংস্থানের অসমতার মাধ্যমে সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে। এটি দারিদ্র্য ও অপরাধ বৃদ্ধি করে এবং সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত করে। সামাজিক সমতা নিশ্চিত করতে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষা মানুষের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং বৈষম্য দূর করতে সহায়তা করে। একটি ন্যায়ভিত্তিক ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য শিক্ষার প্রসার অপরিহার্য।

৫.১০ স্বমূল্যায়ন প্রশ্নাবলী

১. সামাজিক সম্বন্বয় বলতে কি বোঝায়?

২. সামাজিক অসাম্যতা কি এবং সামাজিক অসাম্যতা কিভাবে সামাজিকতাকে প্রভাবিত করে?

৩. পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বলতে তুমি কি বোঝ?

৪. সামাজিক পরিবেশের মধ্যে আপনি কিভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবহারিক পার্থক্য নির্ধারণ করবেন?

৫. সমাজ ও শিক্ষার মধ্যে সম্বন্বয় সাধনের উপায়গুলি সম্বন্ধে বলুন।

৫.১১ অভিসম্বন্ধ (Reference)

Agarwal, J. C (2002) Theory and Principles of Education (13th ed.) New Delhi; Vikash Publishing House.

Bhatia, K & Bhatia, B. D (1992) Theory and Principles of Education (20th Ed) Delhi; Doaba House.

Bhattacharya, D. C (1996). Sociology (6th ed.) Cacutta Vijoya Publishing House.

Pandey, R.S (2009) Principals of Education (13th Ed) Agra-2, Agrawal Publications.

Ravi, S. S (2015) A comprehensive sudy of Education (2nd Ed) Delhi; PHI Learning Sharma, Y. K. (2016) Foundation in Sociology of Education, Delhi;

Saxena, N.R.S (2009) Principles of Education Meerut; Vinay Rakhija

Chandra, S., & Sharma, R. (2006). Sociology of Education.

অধ্যায় ৬ ❑ বহুসংস্কৃতির শিক্ষা (Multicultural Education; Meaning, Characteristics, Goals and Dimension)

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য

৬.২ ভূমিকা

৬.৩ বহুসংস্কৃতির শিক্ষা

৬.৪ বহুসংস্কৃতির শিক্ষার নীতি

৬.৫ বহুসংস্কৃতির শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

৬.৬ বহুসংস্কৃতির শিক্ষার লক্ষ্য

৬.৭ বহুসংস্কৃতির শিক্ষার মাত্রা

৬.৮ সারসংক্ষেপ

৬.৯ স্বমূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

৬.১০ অভিসম্বন্ধ (Reference)

৬.১ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায় পঠনের পর ছাত্র-ছাত্রীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবগত হবেন—

- বহুকৃষ্টিভিত্তি ভিত্তিক সমাজের জন্য শিক্ষা কি?
- বহুসংস্কৃতির শিক্ষার নীতি সম্বন্ধে জানবে।
- বহুসংস্কৃতির শিক্ষার মাত্রা/বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবে।

৬.২ ভূমিকা

অধিকার এবং অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সমাজে সুযোগের সমতা এবং ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করাই বহুকৃষ্টিভিত্তিক সমাজের মূল লক্ষ্য। ভারতীয় সমাজ বিভিন্নতার প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। এইরকম সমাজে প্রতিটি কুলকে এক সাথে গাঁথতে দরকার সুতো, সেই সুতোর কাজটি করে বহুদৃষ্টিভিত্তিক সমাজের শিক্ষা বা

বহুসংস্কৃতির শিক্ষা। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার (Inclusive Education) এর সাথে এর প্রথাগত পার্থক্য হল— এটি অন্তর্ভুক্তির সাথে সাথে অন্যান্য দৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে জায়গা দেয়, শিশুর সাথে সাথে তার পরিবেশ, সংস্কৃতিকে একত্রিত করার ফলে শিশুর বিকাশ আরও ভালোভাবে হয়। তার মধ্যে সহনশীলতা তৈরি করে, উগ্রতা ও সংকীর্ণতাকে বিনষ্ট করে।

৬.৩ বহুসংস্কৃতির শিক্ষা

বহুসংস্কৃতির শিক্ষার উদ্ভব হয়েছে বাস্তব জীবনের দৈনিক সমস্যার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে। পৃথিবীকে আজ 'Global Village' বলা হয়। অভিবাসনের ফলে আজ পৃথিবীতে প্রায় কোন দেশ নেই যেখানে বহুভাষাভাষী ও বিভিন্ন কৃষ্টির মানুষের সমাবেশ নেই, শিক্ষা প্রাঙ্গণকে বলা হয় সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ, সেইজন্যই সমানের অতিফলন শ্রেণীকক্ষে ঘটার ফলে বহুস্কৃষ্টির সমাজ গঠন ও তার জন্য বহুসংস্কৃতির শিক্ষার নীতি গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। বহুসংস্কৃতির শিক্ষার প্রবক্তা ও প্রধান গবেষক James Albert Banks বলেন (১৯৯৭) 'Multicultural education is an idea of an educational reform movement and a procen. As an idea multicultural education seeks to create equal educational opportunities for all'. বহুসংস্কৃতির শিক্ষা একটি ধারণা, একটি শিক্ষণ সংস্কারের আন্দোলন ও প্রক্রিয়া। সাধারণভাবে, বহুসংস্কৃতির শিক্ষার উদ্দেশ্য সকলের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ তৈরি করা। এই শিক্ষা সমস্ত সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে পরিপোষণ করে ও বিভিন্ন সংস্কৃতির পার্থক্যকে মান্যতা দিয়ে তাদের মধ্যে পার্থককে স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে তাদেরকে বিলপ্তির পথ থেকেও উদ্ধার করে। মিশ্র সমাজে সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টির টানাপোড়েনের মধ্যে সুসংহতি বিধান এই শিক্ষা প্রণালীর মাধ্যমে সম্ভব।

৬.৪ বহুসংস্কৃতির শিক্ষার নীতি

James A. Bank যে শিক্ষার নীতিগুলির কথা বলেছেন বহুসংস্কৃতির শিক্ষা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তা নীচে বর্ণনা করা হল।

প্রাথমিক নীতি (Primary Principles)

শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশ—

- সমস্ত কৃষ্টিকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করতে হবে।
- সমস্ত অন্ধবিশ্বাস ও অচলাধ্যাস থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে।
- আন্তঃকৃষ্টির মেলামেশাকে সর্বপ্রচার কাজকর্মের মাধ্যমে উৎসাহপ্রদান করতে হবে।
- নিজ নিজ সাংস্কৃতিক পরিচয় যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেইদিকে মনোনিবেশ করতে হবে।
- প্রতিটি কৃষ্টি অন্য কৃষ্টি থেকে কোনদিক থেকে কিভাবে আলাদা সেই বিষয়ে যত্নশীল হতে হবে।

এই প্রসঙ্গে তিনি চারটি পন্থা বা নীতির বিষয়ে বলেছেন যা সরাসরি শিক্ষণ ও শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অবদানমূলক নীতি (Principles of contribution):

কোন কৃষ্টির ইতিহাসে যেসব ব্যক্তিদের অবদান অনস্বীকার্য তাদের অ্যাখান গল্প আকারে হলেও তুলে ধরতে হবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, বীরসা মুন্ডার গল্প ও সেই প্রসঙ্গে সাঁওতাল বিদ্রোহ।

সংযোজনমূলক নীতি (Additive Principles)

পাঠক্রম তৈরির সময় বিভিন্ন কৃষ্টির গ্রহনীয় উপাদানগুলো সংযোজন করলে তা শিক্ষাক্রমের মাধ্যমেই শেখানো যাবে। সাহিত্যে কোন জনগোষ্ঠীর কাহিনী, ভুগোলে আঞ্চলিক কৃষ্টির জীবন জীবিকার বর্ণনা ইত্যাদি।

রূপান্তরের নীতি (Principals of transformation)

এই নীতি উচ্চ শ্রেনীর জন্য উপযুক্ত। বিভিন্ন সংস্কৃতিকে বোঝার জন্য কোন নির্দিষ্ট উপায় নেই। তাই সময় সুযোগ অনুযায়ী পদ্ধতির তারতাম্য ঘটিয়ে বিভিন্ন কৃষ্টি অনুরূপ শিক্ষী পদ্ধতি প্রয়োগের উপর এই নীতিতে জোর দেওয়া হয়েছে।

সামাজিক সক্রিয়তার নীতি (Principles of Social Action)

এই নীতিতে আন্তঃকৃষ্টির মধ্যে সামাজিক মেলবন্ধন ও বোঝাপড়া সামাজিক স্থাপনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমকে পাঠ্যক্রমের আবশ্যিক অন্তর্ভুক্তি ঘটানোর বলা হয়েছে যেমন সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম, প্রকল্প, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদি।

৬.৫ বহুসংস্কৃতির শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

স্বাধীনতা পরবর্তীতে ভারতবর্ষের বুকে সাম্প্রদায়িক কলহ চিরন্তন ক্ষত, সন্ত্রাস, দুষ্কৃতিমূলক কাজকর্ম ক্রমাগত ভারতমাতার রক্ত ঝরিয়ে চলেছে। শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের কোন দেশই এর করাল গ্রাস থেকে মুক্ত নয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, Cold War, সাম্প্রতিক কালে রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধ, আভ্যন্তরীণ জাতিবিবাদ নিরবিচ্ছিন্ন উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রতিটি প্রতি মানুষ তার সংস্কৃতি ও কৃষ্টি বজায় রাখতে উদ্যোগী, বহুকৃষ্টির মানুষ নিজ নিজ। রাখার উদ্যোগী হওয়ায় অদ্ভুত সমাজের সৃষ্টি হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কিছু জাতিগত দ্বেষ, হিংসা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে সমাজের কাঠামোর তীব্র আঘাত হানে। সমস্যা আরোও প্রবল হয় কৃষ্টি আদান প্রদানের ক্ষেত্রে। যে সংস্কৃতি সেই সমাজে বিদ্যমান, বাইরে থেকে আগত সভ্যতা কৃষ্টি সেই সমাজে ততখানি প্রভাব ফেলে না, ফলে আগত সভ্যতা বর্তমান বিদ্যমান সংস্কৃতির কৃষ্টির আবহে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যায়।

যে সমাজে বিভিন্ন কৃষ্টিভূক্ত জনগোষ্ঠী নিজেস্ব কৃষ্টি বজায় রাখার মাধ্যমে যে শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে পারে, সেই সমাজই হল বহুকৃষ্টিভিত্তিক সমাজ। কৃষ্টিগত পরিচয়ের মধ্যে ভাষা, বিশ্বাস, আস্থা, শিল্প, জীবনশৈল্পী সংগীত সাংস্কৃতি, ঐতিহ্য পরম্পরা সবই অন্তর্গত। কিন্তু সব শর্ত মেনে এইরূপ সমাজ স্থাপন করা বাস্তবে ততধিক কঠিন, কিন্তু যে সমাজে গ্রহণযোগ্যতা সহনশীলতা বেশি, সেই সমাজ বহুকৃষ্টিভিত্তিক সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে ততটাই অগ্রসর। কিন্তু উগ্রজাতীয়তাবাদ, সংকীর্ণতাবাদ, বহুকৃষ্টিভিত্তিক সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে অন্তরায়। এরা দেশ-জাতি, সমাজের ভিতে আঘাত হানে, তাই শিক্ষার মাধ্যমে মন ও মননের অন্তরায় দূর করে তাদেরকে উদারমনস্ক, সহনশীল ও যত্নশীল করে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই বহুকষ্টিভিত্তিক সমানের জন্য শিক্ষা তথা বহুসংস্কৃতির শিক্ষার প্রচলন। বহুসংস্কৃতির সমাজ গঠন এবং সামাজিক কৃষ্টিগত বহুত্ববাদ বজায় রাখার জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা কেই বহুসংস্কৃতির শিক্ষা বিদ্যালয়ের স্তর থেকেই বহুকৃষ্টির প্রতি সহনশীলতা, বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্য ও সংহতি স্থাপন করতে পারে। তার জন্য কয়েকটি নীতিগত বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে।

পেশাগত উন্নয়নের কার্যক্রম (Professional Development Programmes)

- বিষয়ভিত্তিক সিলেবাসের মধ্যে বিভিন্ন কৃষ্টির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরে ছাত্রছাত্রীদের মনে সহনশীলতা ও অন্যকৃষ্টির আর্দশকে সম্মান প্রদানের মানসিকতাকে প্রতিস্থাপিত করা।
- অন্য কৃষ্টির সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধ্যান ধারণা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে রূপমণ্ডুকতার হাত থেকে নিজেকে উন্মুক্ততার দিকে নিয়ে চলা। সেই জ্ঞান যাতে পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে পরিবেশিত হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- মনের গ্লানি ও আচল্যাধ্যাসকে বিমুক্ত করে ছাত্রছাত্রীদের ভিত্তিহীন বদ্ধমূল ধারণা ও জাতিগত এবং বর্ণগত সর্ম্পক সম্বন্ধে পক্ষপাতদুষ্ট ধারণা বিচার থেকে তাদেরকে মুক্ত করতে হবে।
- পাঠক্রম এমন ধরনের হওয়া প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীরা যেন বুঝতে পারে জ্ঞান সামাজিকভাবে সামাজিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্মিত হয়। সামাজিকভাবে নির্মিত জ্ঞানের মধ্যে শিক্ষক শিক্ষিকারা যে সমাজে বসবাস করে, তার সব কৃষ্টির সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিফলন ঘটে। বিদ্যালয়ের দারিত্ব যে সমস্ত পাঠক্রম বর্হিভূত ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি জ্ঞান, দক্ষতা, ও প্রতিন্যাস গঠনের মাধ্যমে সাফল্য লাভে সহায়তা করে তাতে সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে সমান সুযোগ দেওয়া উচিত। এতে অভ্যন্তরীণ সর্মকের উন্নতি হবে।

৬.৬ বহুসংস্কৃতির শিক্ষার লক্ষ্য

বহুসংস্কৃতির শিক্ষা হলো এমন এক ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে শুধু নানা সংস্কৃতি সম্পর্কে জানাই যথেষ্ট নয়, বরং সকলের মধ্যে সামাজিক ন্যায়বিচার, সমতা এবং বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মানোর চেষ্টা

করা হয়। এর লক্ষ্য কেবল পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান দেওয়া নয়, বরং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা। এই শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে একটি সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে সাহায্য করে।নিচে বহুসংস্কৃতির শিক্ষার লক্ষ্য আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং গ্রহণযোগ্যতা গড়ে তোলা (Building Respect and Acceptance for Diversity)

বহুসংস্কৃতির শিক্ষার প্রথম এবং অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করা। বৈচিত্র্য বলতে শুধু জাতি গত বা সাংস্কৃতিক পার্থক্য নয়, বরং ধর্ম, ভাষা, লিঙ্গ, শ্রেণি, শারীরিক অক্ষমতা, এবং অন্যান্য পার্থক্যও অন্তর্ভুক্ত। এটি শিক্ষার্থীদের শেখায় কিভাবে তারা বিভিন্ন সংস্কৃতি, সম্প্রদায়, এবং চিন্তাধারা থেকে শিখতে পারে এবং একে অপরকে সম্মান জানাতে পারে।

উদাহরণ: বিভিন্ন সংস্কৃতির উৎসব, রীতিনীতি, এবং ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা করা। পাঠ্যক্রমে নানা জাতির সাহিত্য, শিল্পকর্ম এবং ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করা। শিক্ষার্থীদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়ে গর্বিত হতে উৎসাহিত করা এবং তাদেরকে ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের অভিজ্ঞতা শোনার সুযোগ দেওয়া।

সামাজিক ন্যায়বিচার এবং বৈষম্য দূরীকরণ (Promoting Social Justice and Eliminating Discrimination)

বহুসংস্কৃতির শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণা গড়ে তোলে। এটি বৈষম্য, বর্ণবাদ, লিঙ্গবৈষম্য, ধর্মীয় বৈষম্য এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করতে সহায়ক। শিক্ষার্থীদের শেখানো হয় যে, সমাজে বৈষম্য এবং অসমতা প্রতিরোধ করা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শিখে।

উদাহরণ: বৈষম্য এবং বর্ণবাদ নিয়ে আলোচনা ক্লাসে অন্তর্ভুক্ত করা। মানবাধিকার এবং সমতার বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা। বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা।

সাংস্কৃতিক সনাক্তকরণ এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি (Enhancing Cultural Identity and Building SelféŸéConfidence)

শিক্ষার্থীদের তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন এবং গর্বিত করা, যা তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। বহুসংস্কৃতির শিক্ষা শিক্ষার্থীদের শেখায় যে তারা যে সংস্কৃতির অংশ, তা তাদের কাছে খুবই মূল্যবান। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং তাদের

সংস্কৃতির প্রতি আস্থাশীল হয়। একই সঙ্গে, তারা অন্যদের সংস্কৃতি সম্পর্কে খোলামেলা মনোভাব পোষণ করতে পারে।

উদাহরণ: সাংস্কৃতিক সেমিনার, প্রদর্শনী বা আলোচনা আয়োজন করা যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করতে পারে। শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতির মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস এবং আত্মপরিচয় তৈরি করা।

আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি (Enhancing Intercultural Communication Skills)

বহুসংস্কৃতির শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগের দক্ষতা গড়ে তোলার লক্ষ্য রাখে। এটি শেখায় কিভাবে তারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পটভূমি থেকে আগত ব্যক্তিদের সাথে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে পারে। এটি সাংস্কৃতিক পার্থক্য এবং ভাষাগত বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করতে সাহায্য করে।

উদাহরণ: শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন ভাষায় যোগাযোগের মৌলিক দক্ষতা শেখানো। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রোগ্রাম চালু করা।বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে সংলাপ তৈরি করার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান এবং আলোচনা সেশন আয়োজন করা।

গ্লোবাল সিটিজেনশিপ এবং আন্তর্জাতিক সচেতনতা (Global Citizenship and International Awareness)

বহুসংস্কৃতির শিক্ষা শিক্ষার্থীদের একটি গ্লোবাল সিটিজেন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কাজ করে। এরমাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে যে তারা একটি বৃহত্তর পৃথিবীর অংশ এবং তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলতে পারে। এটি শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বৈশ্বিক সমস্যাগুলোর সমাধান এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

উদাহরণ: জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs) সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করা। বিশ্ব শান্তি, পরিবেশগত সুরক্ষা, এবং মানবাধিকার নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা। আন্তর্জাতিক মহামারী, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্ব অভিবাসন সম্পর্কিত সমস্যা নিয়ে আলোচনা।

সামাজিক দক্ষতা এবং সহযোগিতা গড়ে তোলা (Fostering Social Skills and Collaboration)

বহুসংস্কৃতির শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা এবং সামাজিক দক্ষতা গড়ে তোলার লক্ষ্য রাখে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে কাজ করার এবং ভিন্ন মতামতকে শ্রদ্ধা করার মনোভাব তৈরি করা। এটি তাদের মধ্যে সামাজিক সংহতি এবং সহানুভূতি তৈরি করতে সাহায্য করে, যা ভবিষ্যতে একটি

শান্তিপূর্ণ সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উদাহরণ: দলগত প্রকল্প এবং দলগত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা শেখানো। শিক্ষার্থীদেরকে সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা নিয়ে একে অপরের মতামত শোনার এবং সম্মান করার সুযোগ দেওয়া। দলগত কার্যক্রম, যেমন বিদ্যালয়ের মধ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মেলা আয়োজন করা।

সমতা এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করা (Preparing Students for Equality and Justice)

বহু সংস্কৃতির শিক্ষাশিক্ষার্থীদের সমতা এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত করে। এটি শিক্ষার্থীদের শিখায় যে, বৈষম্য এবং সামাজিক অস্থিরতা মোকাবিলা করার জন্য তাদের একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। শিক্ষার্থীরা তাদের অধিকার এবং সমাজে তাদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হতে পারে, এবং সেই অনুযায়ী তারা ন্যায়বিচার এবং সমতার পক্ষে কাজ করবে।

উদাহরণ: সামাজিক সমস্যা, যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বৈষম্য, নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্রদের মধ্যে আলোচনামূলক সভা এবং কর্মশালা আয়োজন।

৬.৭ বহুসংস্কৃতির শিক্ষার মাত্রা

বহুসংস্কৃতির শিক্ষা এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা যা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর প্রতি শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, এবং বোঝাপড়া তৈরি করতে সাহায্য করে। জেমস এ. ব্যাংকস, বহুসংস্কৃতির শিক্ষার একজন বিশেষজ্ঞ, এই শিক্ষার পাঁচটি মূল মাত্রা চিহ্নিত করেছেন, যা শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক ন্যায়, এবং সমতা উপলব্ধি করতে সহায়ক। এই মাত্রাগুলি একত্রে একটি শক্তিশালী শিক্ষা কাঠামো গঠন করে যা সকল শিক্ষার্থীর জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমান সুযোগ প্রদান করে। এই প্রবন্ধে, আমরা ব্যাংকসের বহু সংস্কৃতির শিক্ষার পাঁচটি মাত্রাবিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

বিষয়বস্তুর একীকরণ (Content Integration)

বিষয়বস্তুর একীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যা শিক্ষার পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদান অন্তর্ভুক্ত করার ওপর গুরুত্ব দেয়। এটি নিশ্চিত করে যে, শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র একটি সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়, বরং বহু সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথিবী এবং ইতিহাসকে দেখতে শিখে। এই একীকরণে বিভিন্ন দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প, ধর্ম, দর্শন, এবং ঐতিহ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যখন একটি পাঠ্যক্রমে শুধুমাত্র এক সংস্কৃতির উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকে, তখন তা শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সংকীর্ণ করে এবং তারা বিশ্বের বৈচিত্র্য বুঝতে অক্ষম হয়। অন্যদিকে, যখন শিক্ষায় বিভিন্ন সংস্কৃতির উপাদান অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন শিক্ষার্থীরা আরও বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি লাভকরে। এটি তাদের মধ্যে সহানুভূতি,

সমবেদনা এবং আন্তর্জাতিক সচেতনতা তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন দেশের বিপ্লব এবং সংগ্রামের কাহিনী অন্তর্ভুক্ত করা, বিভিন্ন জাতির সাহিত্য এবং শিল্পের বিশ্লেষণ করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা তৈরি করে।

জ্ঞান গঠনের প্রক্রিয়া (Knowledge Construction Process)

জ্ঞান গঠনের প্রক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ, যা শিক্ষার্থীদের শেখায় কিভাবে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পক্ষপাত তাদের জ্ঞান গঠনের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। পৃথিবীকে আমরা যেভাবে দেখি এবং জানি তা অনেকটাই আমাদের সাংস্কৃতিক পটভূমির ওপর নির্ভর করে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা শিখে যে, জ্ঞান শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি হয় না, বরং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি হয়।

শিক্ষার্থীরা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জানে যে, তাদের শিক্ষা এবং জ্ঞান যে সামাজিক কাঠামোতে গড়ে উঠেছে, তা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি এবং সমাজের পক্ষ থেকে প্রভাবিত। উদাহরণস্বরূপ, ইতিহাসের একটি ঘটনা যেমন এক ধরনের সাংস্কৃতিক পটভূমি থেকে দেখা হয়, তবে অন্য একটি সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে এটি সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের পক্ষপাতিত্বের বিষয়ে সচেতন হয় এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করতে শিখে।

পক্ষপাত কমানো (Prejudice Reduction)

পক্ষপাত কমানোর উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতিবাচক ধারণা, পক্ষপাত এবং বৈষম্য কমানো। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে শিক্ষার্থীরা শিখে কিভাবে তাদের মধ্যে লুকানো বা প্রকাশ্যভাবে বিদ্যমান নেতিবাচক ধারণাগুলি পরিবর্তন করতে হয়। পক্ষপাত কমানো শুধুমাত্র ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন করার জন্য নয়, বরং এটি সামাজিক পরিবর্তনও আনতে সাহায্য করে।

শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের মধ্যে থাকা পক্ষপাত এবং নেতিবাচক ধারণাগুলির দিকে মনোযোগ দিতে শিখে। এই প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলে এবং তারা সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে উৎসাহিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ক্লাসরুমে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা এবং তাদের ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা, তাদের মধ্যে বৈষম্য এবং পক্ষপাত কমাতে সহায়ক।

সমতাপেডাগোজি (Equity Pedagogy)

সমতাপেডাগোজি হল এমন একটি শিক্ষণ কৌশল যা নিশ্চিত করে যে, সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য সমান শিক্ষা সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। এটি শিক্ষকদের কাছে শিক্ষণ কৌশল এবং পদ্ধতিগুলি অভিযোজিত করতে শেখায়, যাতে সব ধরনের শিক্ষার্থীর প্রয়োজন মেটানো যায়। সমতাপেডাগোজির মূল উদ্দেশ্য হল যে

সকল শিক্ষার্থী, তাদের জাতিগত, সাংস্কৃতিক, বা আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে, তাদের পারদর্শিতার সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম করে তোলা।

এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিশেষ চাহিদা এবং পটভূমি অনুযায়ী শিক্ষণ কৌশল গ্রহণ করা হয়। এটি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের দায়িত্ব তৈরি করে, যেখানে সমস্ত শিক্ষার্থী নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ে গর্বিত হতে পারে এবং তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা অনুসরণ করতে পারে। সমতাপেডাগোজি এমন একটি শিক্ষণ কৌশল তৈরি করে যা বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি গড়ে তোলে।

ক্ষমতায়ন স্কুল সংস্কৃতি এবং সামাজিক কাঠামো (Empowering School Culture and Social Structure)

ক্ষমতায়ন স্কুল সংস্কৃতি এবং সামাজিক কাঠামো হল একটি প্রক্রিয়া, যেখানে বিদ্যালয়য়ের পরিবেশ এবং সামাজিক কাঠামো এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যাতে তা বৈচিত্র্য এবং সমতা উৎসাহিত করে। এটি নিশ্চিত করে যে, সমস্ত শিক্ষার্থী তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ে গর্বিত হতে পারে এবং সমান সুযোগ পায়। ক্ষমতায়ন বিদ্যালয় সংস্কৃতি এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজেদেরকে সমর্থিত এবং অন্তর্ভুক্ত মনে করে।

এটি একটি শিক্ষাগত পরিবেশ তৈরি করে যেখানে সকল শিক্ষার্থী সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং বিদ্যালয়য়ের নীতিমালা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারে। স্কুলের সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য এবং সমতার প্রতি শ্রদ্ধা তৈরি করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং সহযোগিতা গড়ে তোলে।

৬.৮ সারসংক্ষেপ

শিক্ষা ও শিক্ষণকে দৃষ্টিগত ভাবে সংবেদনশীল করে তোলার জন্য শিক্ষন কৌশল ও মূল্যায়নের সমস্ত কৌশল সুপরিকল্পিতভাবে সংবেদনশীলতার সাথে পরিমার্জিত ও পরিবর্তন করা অবশ্য কর্তব্য। আমাদের দেশ বহুসংস্কৃতির সহাবস্থান প্রাচীনকাল থেকেই ছিল, আজও আছে। কিন্তু সহাবস্থান থাকলেও নাগরিক হিসাবে বহুপ্রান্তিক সমাজের জনগোষ্ঠী ছিল মূল সমাজের বাইরে। কিন্তু তাদের এক সর্বসমাবিষ্ট সমানের সদস্য হিসাবে গড়ে তুলতে হলে যে প্রয়াস প্রয়োজন তার জন্যই বহুসংস্কৃতির শিক্ষার ভাবনা অত্যন্ত জরুরী।

৬.৯ স্বমূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

১. বর্তমান সমাজে বহুসংস্কৃতির শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি?

২. বহুসংস্কৃতির শিক্ষার সংজ্ঞা কি?

৩. বহুসংস্কৃতির শিক্ষার প্রবর্তক কে?

৪. বহুসংস্কৃতির শিক্ষার নীতি কি?

৫. ভারতীয় সমাজে এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন।

৬.১০ অভিসম্বন্ধ (Reference)

Ajten. I. (2001) Nature and Operation of Attitudes Annual Review of Psychology. 52. 27-58

Banks. J.A. (2009) Diversity and Citizenship Education in Multicultural Nations. Multicultural Education, 1, 1-28

Driscoll, M.P. (2014) Psychology of Leaming for Instructions, Essex, United Kingdom. Pearson,

একক ৭ ❑ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া : ধারণা এবং তাৎপর্য (Socialization Process : Concept and Its Significance)

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য

৭.২ ভূমিকা

৭.৩ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

৭.৪ সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা (Role of Family in Socialization)

৭.৫ সামাজিকীকরণে বিদ্যালয়ের ভূমিকা (Role of Family in Socialization)

৭.৬ সারসংক্ষেপ

৭.৭ স্বমূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

৭.৮ অভিসম্বন্ধ (Reference)

৭.১ উদ্দেশ্য

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজের কাঠামো, সম্পর্ক, এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা।
- শিক্ষার্থীদের সমালোচনামূলক চিন্তা, ন্যায়বিচার, এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে তাদেরকে সমাজে পরিবর্তন আনার জন্য প্রস্তুত করে।
- সমাজের বৈষম্য, দারিদ্র্য, লিঙ্গবৈষম্য এবং জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শিক্ষার্থীদের চেতনা তৈরি করা।

৭.২ ভূমিকা

সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষা সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা প্রদান করে এবং তাদেরকে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। এটি মানবাধিকার, সমানাধিকার, সামাজিক ন্যায়, এবং মৌলিক মানবিক মূল্যবোধের প্রতি গভীর মনোযোগ দেয়। সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধানে সৃজনশীল চিন্তা এবং কার্যকর সমাধান প্রস্তাব করার ক্ষমতা তৈরি করে,

যা তাদের পেশাগত এবং সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৭.৩ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

জন্মের পর শিশু তার শারীরিক চাহিদা পূরণে ব্যস্ত থাকে। যখন সে বড় হতে থাকে, তার চাহিদা, আশা-আকাঙ্খা স্বীকৃতি ও আদর্শ বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যায়। সমাজে বড়রা সামাজিক আর্দশে অনুপ্রাণিত হয়। কিন্তু ব্যক্তিত্ব বিকাশ কোন স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া নয়। নবজাতকে ব্যক্তিত্ববিকাশের সামাজিক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রত্যেক সমাজে তার নিজস্ব উপায় প্রস্তুতি নির্দেশ করে। এই সামাজিক প্রশিক্ষণই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া হিসাবে পরিচিত, এটি একটি জীবন ব্যাপী প্রক্রিয়া, মানুষ নিজের সমাজে থেকেই তার সামাজিক মূল্যবোধ শেখে। Drever এর মতে 'Socialization is a process by which the individual is adapted to his social environment (by attaining social conformity) and becomes a recognized, co-operating and efficient member of it'.

সংজ্ঞা (Definition) : মার্গারেট মিড ও লিন্টনের মত নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের মতে, সমমাজিকরণ হল কোন গোষ্ঠীর সংস্কৃতি গ্রহণের প্রক্রিয়া। সংস্কৃতি বলতে আমরা সাধারণ, ঐতিহ্য, কার্যাবলী, জ্ঞান, কৃষ্টি ইত্যাদিকে অন্তভুক্ত করি।

বসের মতে, সামাজিকীকরণ হল একটি অনুভূতি এবং সাহয্যে ও একসাথে কাজ করার ইচ্ছার মাধ্যমে বিকাশিত হয়।

Cook বলেছেন, সামাজিকীকরণের ফলস্বরূপ, একজন শিশু ক্রমে সমাজের অংশ হয়ে ওঠে এবং সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে সমাজের উন্নতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

৭.৩ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া (Process of Socialization)

বিভিন্ন সামাজিক উপাদান যা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

শিশু পালন (Child Rearing) : সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবারের ভুমিকা বিশেষভাবে কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত প্রস্তাবে পরিবারের মধ্যেই সামাজিকীকরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকে শিশুর জন্মের আগে থেকে। পারিবারিক জীবনের মধ্যেই শিশুর শৈশব কাটে, শিশু পালিত হয়। স্বভাবতই পরিবার জীবনের সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট যাবতীয় পরিবরের মধ্যেই সামাজিক নীতিবোধ ও নাগরিক চেতনার সূত্রপাত ঘটে। সহযোগিতা, সহিষুতা, সম্প্রীতি, আত্মত্যাগ, রীতিনীতি, সামাজিক নিয়মাবলী প্রভৃতি শিক্ষা শিশু পরিবারের মধ্য থেকেই অর্জন করে।

সহমর্মিতা (Sympathy) : লালন-পালনের মতো, সহনুভূতিও একটি শিশুর সামাজিকরণে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করে। শৈশবে, শিশু তার সমস্ত প্রয়োজনীয়তা মেটানোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পরিবারের উপর নির্ভরশীল। পরিবার শুধু শিশুর চাহিদা পুরণ করে না, তার সাথে প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সহযোগিতা ও সহমর্মিতা দেখায়। এই সহমর্মিতায় শিশুর মধ্যে 'আমরা বোধ' জাগায় এবং তাকে তার প্রকৃত শুভাকাঙ্খী থেকে অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে বৈষম্য করতে শেখায়। শিশু সেই সমস্ত মানুষদেরকে আরোও বেশি ভালোবাসতে শুরু করে যারা শির সাথে সহানুভূতি দেখায়।

সহযোগিতা (Co-operation) : সমাজ শিশুকে সামাজিক করে তোলে। অন্য কথায় বলতে গেলে, সহযোগিতা শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশু যাদের কাছ থেকে সহযোগিতা পায়। পরবর্তীক্ষেত্রে, তাদের প্রতিও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

পরামর্শ (Suggestion) : সামাজিক পরামর্শ শিশুর সামাজিকীকরণকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। শিশু তার শুভাকাঙ্খীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে। সুতরাং, পরামর্শ সামাজিক আচরণের দিক নির্ধারণ করে।

সনাক্তকরণ (Identification) : বাবা-মা, শুভাকাঙ্খী ও আত্মীয়স্বজনের ভালোবাসা শিশুর মধ্যে তাদের সাথে পরিচয়ের অনুভূতি গড়ে তোলে। যারা শিশুর সাথে সহানুভূতিশীল আচরণ করে, শিশু তাদেরকে শুভাকাঙ্খী হিসাবে বিবেচনা করে সেই অনুযায়ী কাজ করতে থকে।

অনুকরণ (Imitation) : সামাজিকীকরণের মূল বিষয় হল অনুকরণ, শিশুকে সামাজিক করে তোলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল অনুকরণ, শিশু তার পরিবারের সদস্যদের আচরণ, আবেগ, অনুভূতি অনুকরণ করে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। অনুকরণ শিশুকে সামাজিক করে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

সামাজিক শিক্ষা (Social Teaching) : অনুকরণ ছাড়াও, সামাজিক শিক্ষা শিশুর সামাজিকীকরণকে প্রভাবিত করে। সামাজিক শিক্ষা পরিবারের দ্বারা শিশুর মধ্যে সঞ্চালিত হয়।

পুরষ্কার এবং শাস্তি (Reward & Punishment) : পুরষ্কার ও শাস্তি একটি শিশুর সামাজিকীকরণের উপর বড় প্রভাব ফেলে। যখন একটা শিশু সমাজের আদর্শ ও বিশ্বাস অনুযায়ী আচরণ করে, লোকেরা তার প্রশংসা করে ও তার আচরণকে অনুমোদন করে। উল্টে কিছু অসামাজিক কাজ করলে তার সমালোচনা হয় এবং সমাজ দ্বারা নিন্দিত হয়। এই ধরনের শাস্তি শিশুকে অসামাজিক অবস্থা থেকে দূরে সরিয়ে দেয় ও সঠিক সামাজিকীকরণের দিকে পরিচালিত করে।

৭.৪ সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা (Role of Family in Socialization)

পরিবার সমাজের সবচেয়ে প্রাচীন ও দীর্ঘস্থায়ী সংগঠন। পরিবারেরই শিশুর সামাজিকীকরণ শুরু। পরিবার সাধারণ পিতা, মাতা, এবং তাদের সন্তান-সন্ততি সহ আরোও দু-চারজন লোকের সম্বন্বয়ে গড়ে

ওঠে যারা একই বাড়িতে থাকে এবং একই আদর্শ ও সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। সমাজব্যবস্থায় প্রতি পরিবারের যে সাধারণ মনোভাব থাকে তা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত শিশু মনের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করে। পরিবারের যৌথ সিদ্ধান্ত সমূহ শিশুর কাছে কর্তৃত্ববাহক প্রতিপন্ন হয়। ঐতিহ্যগত ভাবে, প্রতিটি সমাজে পরিবারকে একটি একক হিসাবে দেখা হয়েছে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানে যা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

প্রতিটি শিশু কোন না কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। এবং তার দায়িত্ব পরিবার নেয়। পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে লালন-পালন, আর্দশ বা গৃহীত অচরণ শেখানো হয়। মূলত এটি বলা যেতে পারে, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়, প্রত্যেকের জন্য পরিবার থেকে। এখানে পিতা-মাতা, বিশেষত্ব শিশুর উপর মাতৃত্বের খুব বেশি প্রভাব দেখা যায়। মা ও সন্তানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক শিশুর ক্ষমতা গঠনের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। ফলে বলা যায়, এভাবেই শিশু তার সামাজিক যোগ্যতা অর্জন করে এবং কালক্রমে সেই যোগ্যতাকে পরিবর্ধিত করে। শিশু কথা ও ভাষা শেখে পরিবারের মাধ্যমেই। জীবনের শুরু থেকেই পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে শিশুর জৈবিক, মানসিক আশা আকাঙ্খাসমূহ পরিতৃপ্ত হয়ে থাকে। পরিবারের আবেগময় পরিবেশে শিশুর সামাজিকীকরণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘাট।

৭.৫ সামাজিকীকরণে বিদ্যালয়ের ভূমিকা (Role of Family in Socialization)

সমাজজীবনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয়ে হল প্রথাভিত্তিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ মাধ্যম। প্রাথমিক স্তরে, শিশুর মনে সমাজচেতন জাগিয়ে তোলা এবং প্রচলিত আচার অনুষ্ঠান, লোকসংস্কৃতির সাথে পরিবারের পরিয়ে করিয়ে দেওয়া। এই সামাজিকীকরণ শিশুর সামাজিক পরিচয়ের জন্য অতীব প্রয়োজন।

পরবর্তী পর্যায়ে প্রাক কৈশোর, কৈশের এবং যৌবণে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হল প্রতিটি ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিকে মানবসম্পদে পরিণত করে তোলা। আদর্শ মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়দায়িত্ব সম্পন্ন সুনাগরিক গড়ে তুলতে শিক্ষারর্থীকে সহায়তা করে শিক্ষালয়। গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিকদের সুস্থ মনোভাব গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষার।

বিদ্যালয়ের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল— প্রতিটি সমাজের নিজেস্ব প্রথা, রীতি, ঐতিহ্য, শিল্প, ধর্ম যা প্রাচীনকাল থেকে সেই সমাজে উত্তরাধিকার সূত্রে বহমান তা বিদ্যালয় সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া মাধ্যমে উত্তরাধিকারী হিসাবে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সরবরাহ করে ও সেই সমাজে মুল্যবোধ ও আচরণের নিদর্শন তৈরি করে। শিক্ষার সাহায্যে ছাত্ররা 3R (পড়া, লেখা ও পাটিগণিত) সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করে এবং দৈনন্দিন জীবনে পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনে তার প্রয়োগ করে ও সমাজে সুখে বসবাস করে। একমাত্র বিদ্যালয় যা এই 3R কে 7R কে রূপান্তরিত করে অর্থাৎ পড়া, লেখা, গণিত এর সাথে সম্পর্ক, দায়িত্ব, বিনোদন ও পুনর্গঠন যুক্ত হয়। বিদ্যালয়ই একটি শিশুকে সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান

দান করে তাকে সামাজিক ক্ষেত্রে দায়িত্ববান করে তোলে। বিদ্যালয় শিশুকে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে বড় করে তাকে সেই পরিবেশের উপযুক্ত হিসাবে গড়ে তোলে। ছাত্ররা গণতান্ত্রিক পরিবেশে কিভাবে নিয়মকানুন শিখবে, কিভাবে অন্যদের সাথে ব্যবহার করবে এগুলির মধ্যদিয়েই শিশুর সামাজিকীকরণ সাধিত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা এমন একটি পরিবেশ যার মাধ্যমে শিশুর প্রতিনিয়ত চরিত্র ও গুণাবলী গঠনের মাধ্যমে শিশু তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ ও সম্ভাবন পুরাণে সক্ষম হয়ে ওঠে, বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ধরনের সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করে তোলে এবং এইসব ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তাদের মধ্যে নেতৃত্ব বিকশিত হয়। বিদ্যালয় শিশুকে সামাজিক পরিবেশ প্রদান করে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজে উৎসাহ দানের মাধ্যমে, সমাজ সেবামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদানের মাধ্যমে, সামাজিক অনুষ্ঠান, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্পাদানের মাধ্যমে। এর ফলে শিশুর মধ্যে বিভিন্ন নিয়ম ও সামাজিক মূল্যবোধ যেমন— সহানুভূতি, সহযোগিতা, সহনশীলতা, সামাজিক চেতনা ইত্যাদির বিকাশ হয় যার ফলে শিশুর মধ্যে সামাজিক আচরণ গড়ে ওঠে।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলতে পারি যে, শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বিদ্যালয়ের বিশেষ তাৎপর্য আছে। শিক্ষা হল গতিশীল পরিবাহিক প্রক্রিয়া, যা শিশুর মধ্যে চিন্তাভাবনা, যুক্তি, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ইত্যাদির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সঠিক সঞ্চার ঘটিয়ে সমাজে সঠিক আচরণের বীজের বপন করে ও সামজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। Emaile Durkheim, ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ শিশুর সামাজিকীকরণে শিক্ষার ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছেন— 'Education is the influence exercised by adult generation on those that are not yet ready for social life. Its object is to arouse and to develop in the child a certain number of physical, intellectual and moral traits that are demanded of him by the society', সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে, শিক্ষা আগামী প্রজন্মের সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়।

বিদ্যালয় বিভিন্নভাবে শিশুকে সামাজিক করে গড়ে তোলে।

প্রথমত, শিক্ষার্থীরা তাদের বয়স অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট পাঠক্রমের মাধ্যমে 3R লেখা, পড়া ও পাটিগণিত শেখার মাধ্যমে সমাজের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। তাদের এই পর্বে তাদেরকে সমাজের উৎপাদনশীল সদস্য হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীরা তাদের সহপাঠীদের সাথে বিদ্যালয়ে মেলামেশা করে, এর ফলে পারস্পরিক ক্ষেত্রে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার পরিবেশ সংগঠিত হয়।

তৃতীয়ত, বিদ্যালয় গৃহ পরিবেশের সম্পূরক ভূমিকা পালন করে। পরিবারে যে অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব নয় তা বিদ্যালয় পরিবেশে লাভ করা যায়।

যেখানে কার্যকরী তাত্ত্বিকরা বিদ্যালয়ের সামাজিকীকরণের এই সমস্ত দিকগুলি উদ্ধৃত করেন, সেখানে

দ্বন্দ্ব তাত্ত্বিকরা পরিবর্তে জোর দেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত লুকনো পাঠক্রমের উপর। স্কুলটি যে সমাজে আছে, সেই সমাজের কৃষ্টি ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধ শিশুর মধ্যে সঞ্চার করা হয়। শিশু প্রাথমিকভাবে দেশের ভালো জিনিসগুলির সম্বন্ধে অবগত হয় তা সে পুরনো হোক বা নতুন। তারা শেখে সামাজিক জীবনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ধৈর্য, ও প্রয়োজনীয়তা। তাদেরকে শেখানো হয় কিভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে হয় ভালো নম্বর, গ্রেড ও অন্যান্য পুরস্কার জিততে। এইভাবে তারা দেশকে ভালোবাসতে শেখে এবং দেশের ঘামতি ধরতে শেখে, তারা এমন বৈশিষ্ট্যগুলি শেখে যা তাদেরকে কাজের জন্য প্রস্তুত করে ও ভবিষ্যতে দেশের একজন উৎপাদনশীল নাগরিক হতে সাহায্য করে। সামাজিক প্রভাব প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রভাব শুরু হবার অনেক আগে থেকে শুরু হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ হবার পরও চলে।

৭.৬ সারসংক্ষেপ

একটি গোষ্ঠী সামাজিক গোষ্ঠী হয়ে ওঠে যখন, তখন তার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার সম্পর্ক থাকে, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া সামাজিক গোষ্ঠীর মৌলিক শর্ত। বাজারে, মেলায় শত শত মানুষ হাঁটছে, ট্রেনে বহুলোক ভ্রমণ করছে, তারা সামাজিক দল নয়, এর প্রাণ তাদের মধ্যে পারস্পরিকভাবে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ঘটছে না। দুই ব্যক্তি, একজন থাকে পশ্চিমবঙ্গে আর অন্যজন থাকে নিউ ইয়র্কে, টেলিফোনে কথপোকথনের মধ্য দিয়েই তাদের সামাজিক মিথস্ক্রিয়া সাধিত হয়। যদিও তারা একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে তবুও। সামাজিক গোষ্ঠী তৈরি হয় সেই সমাজ ও তার সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে। মানুষ সামাজিক গোষ্ঠীরই ফসল। বেশিরভাগ শিক্ষাবিদ বিশ্বাস করেন যে, মানুষ এই পৃথিবীর বুকে সবথেকে সফলতম জীব, তার একমাত্র কারণ, মানুষ পরস্পরের একত্রে এই পৃথিবীর বুকে বসবাস করতে পারে। মানুষ সবসময় অন্য মানুষের উপর প্রতিরক্ষ, খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য নির্ভরশীল। তারা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করে। এই পারস্পরিক সহযোগিতাই সামাজিক গোষ্ঠীগুলি গড়ে ওঠার মূল ভিত্তি। এটি মানব সমাজের ভিত্তি, শিক্ষা ও গোষ্ঠীজীবনের সম্পর্ক খুব নিকট। শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই গোষ্ঠীগুলি তাদের পরস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ব্যাপ্ত হয়। প্রাথমিক ও গৌণ গোষ্ঠীগুলি শিশুকে নানান ধরনের মিথস্ক্রিয়ায় সাহায্য করে থাকে। অন্তগোষ্ঠী বইগোষ্ঠীগুলি শিশুকে নানান ধরনের মিথস্ক্রিয়ার সাহায্য করে থাকে, অর্ন্তগোষ্ঠী, বর্হিগোষ্ঠী ও নির্দেশক গোষ্ঠী ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলি শিক্ষা প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এজন্য সঠিক নির্দেশ ও পরামর্শদানের প্রয়োজন।

৭.৭ স্বমূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

১। সামাজিকীকরণের সংজ্ঞা কী? এর প্রধান উপাদানগুলো কী কী?

২। পরিবারের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন। শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবার কীভাবে সহায়তা করে?

৩। বিদ্যালয়ের ভূমিকা কীভাবে শিশুর সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ?

৪। সামাজিকীকরণের কোন কোন প্রক্রিয়া শিশুর মধ্যে সামাজিক আচরণ গড়ে তোলে?

৫। Drever-এর সামাজিকীকরণের সংজ্ঞা এবং তা সমাজে কিভাবে প্রভাব ফেলে?

৬। সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ায় 'পুরষ্কার ও শাস্তি' কীভাবে ভূমিকা রাখে?

৭.৮ অভিসম্বন্ধ (Reference)

Agarwal, J. C (2002) Theory and Principles of Education (13th ed.) New Delhi; Vikash Publishing House.

Bhatia, K & Bhatia, B. D (1992) Theory and Principles of Education (20th Ed) Delhi; Doaba House.

Bhattacharya, D. C (1996). Sociology (6th ed.) Cacutta Vijoya Publishing House.

Pandey, R.S (2009) Principals of Education (13th Ed) Agra-2, Agrawal Publications.

Ravi, S. S (2015) A comprehensive sudy of Education (2nd Ed) Delhi; PHI Learning Sharma, Y. K. (2016) Foundation in Sociology of Education, Delhi;

Saxena, N.R.S (2009) Principles of Education Meerut; Vinay Rakhija

Chandra, S., & Sharma, R. (2006). Sociology of Education.

একক ৮ ❑ সামাজিক গোষ্ঠী : ধারণা ও বৈশিষ্ট্য এবং শিক্ষার ভূমিকা (Social Group : Concept and Characteristics, and Role of Education)

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য

৮.২ ভূমিকা

৮.৩ সামাজিক গোষ্ঠীর ধারণা

৮.৪ সামাজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য

৮.৫ সামাজিক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা

৮.৬ সারসংক্ষেপ

৮.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

৮.৮ অভিসম্বন্ধ (Reference)

৮.১ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর, ছাত্র-ছাত্রীরা সক্ষম হবেন—

- সামাজিক গোষ্ঠী সম্বন্ধে সুপষ্ট ধারনা তৈরি করতে
- সামাজিক গোষ্ঠীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারনা গঠন করতে

৮.২ ভূমিকা

সমাজতত্ত্ব কি, এর সংজ্ঞা কি, সমাজতন্ত্রের পরিধি ও পন্থা সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে বিগত অধ্যায় গুলির মাধ্যমে সপষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছে। এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব সামাজিক গোষ্ঠী কি, এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য কি তার সম্বন্ধে।

যখন কোন শিশু এই সুন্দর পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়, জন্মমাত্র সে কোন না কোন পরিবারের অবেচ্ছদ্য অংশ হয় এবং সেই পারিবারিক পরিচয়ে বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু তার জীবন পারিবারিক চৌহদ্দির মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকে না। বসুধেব কুটুম্বকম ক্রমেই সেই শিশুর পরিধি বাড়ে ও সারা বিশ্ব তার পরিবার হয়ে ওঠে। সারা বিশ্বের সাথে সে তার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান করে। গ্রীক দার্শনিক

অ্যারিষ্টটল বলেছিলেন, মানুষ সামাজিক জীব, সমাজে সে না পশুর মত, না দেবদূতের মত বসবাস করে। সামাজিক গোষ্ঠী বলতে এক বিশেষ ব্যক্তি সমষ্টিকে বোঝায়। জিসবার্ট বলেছেন—'A social group is collection of individuals interacting on each other under a recognizable structure'. বিভিন্ন প্রকারে ও রূপে এই সামাজিক সম্পর্ককেই গোষ্ঠী বলা হয়।

৮.৩ সামাজিক গোষ্ঠীর ধারণা (Concept of Social Group)

সামাজিক গোষ্ঠী কেবল একটি শারীরিক বা ভূগোলিক সমাবেশ নয়, এটি এমন একটি কাঠামো যেখানে সদস্যরা পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক কার্যাবলি এবং যোগাযোগের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করে। একজন ব্যক্তি যে গোষ্ঠীর সদস্য, তার মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট আচরণ, মূল্যবোধ এবং বিধি-নিষেধ কার্যকর থাকে, যা গোষ্ঠীটির সামগ্রিক ঐক্য এবং কার্যকারিতা বজায় রাখে। এর মধ্যে সদস্যরা একে অপরের মধ্যে সম্পর্ক এবং দায়িত্বের প্রতি সচেতন থাকে এবং তাদের কার্যাবলি নির্ধারণ করে।

একটি সামাজিক গোষ্ঠী তার নিজস্ব আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা, শৃঙ্খলা এবং সামাজিক পরিচিতি তৈরি করে, যা গোষ্ঠীটির সদস্যদের মধ্যে একতা এবং ঐক্য বজায় রাখে। একই সঙ্গে, গোষ্ঠীটির মধ্যে সম্পর্কের তলিয়ে থাকা মন্ত্রণা, শিক্ষা এবং শক্তির বিনিময়ও ঘটে থাকে, যা সমাজের বৃহত্তর কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ধরনের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সদস্যরা তাদের স্থান এবং ভূমিকা বুঝে এবং একে অপরের প্রতি আচরণে সুসংহত থাকে, যা সমাজের নির্দিষ্ট দিকগুলির সামগ্রিক প্রগতির জন্য অপরিহার্য।

গোষ্ঠী সাধারণত নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, মূল্যবোধ বা সংস্কৃতির মাধ্যমে একত্রিত হয়। এই উদ্দেশ্যগুলি বিভিন্ন সামাজিক কাঠামো যেমন পরিবার, জাতি, ধর্ম, শিক্ষা, রাজনৈতিক পার্টি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান এবং সম্পর্কের ভিত্তিতে, এর সদস্যরা নিজেদের চিন্তা ও বিশ্বাসকে ভাগ করে এবং গোষ্ঠীটির অগ্রগতিতে অবদান রাখে। এই পর্বে সমাজ গোষ্ঠীর সংজ্ঞা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হবে। সামাজিক গোষ্ঠী বলতে সেই সমষ্টিকে বোঝানো হয়, যেখানে একাধিক ব্যক্তি একে অপরের সাথে সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে যুক্ত থাকে। এই সম্পর্কগুলো হতে পারে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে, এবং এটি তাদের আচার-আচরণ, মূল্যবোধ এবং অভ্যাসের মাধ্যমে গঠিত। সমাজ গোষ্ঠী এক ধরনের সামাজিক কাঠামো, যেখানে সদস্যরা নির্দিষ্ট এক উপাদান বা উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে একত্রিত হয় এবং পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

সামাজিক গোষ্ঠীর সংজ্ঞা (Definition of Social Group) : এখানে বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদদের দেয়া সংজ্ঞাগুলির মাধ্যমে সামাজিক গোষ্ঠী কী তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

Ogburn এবং Nimkoff বলেছেন, 'যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি পরস্পরের সংস্পর্শে এসে

পরস্পরকে প্রভাবিত করে, তখন তারা সামাজিক গোষ্ঠী তৈরি করে।' অর্থাৎ, সামাজিক গোষ্ঠী গঠন হয় তখনই, যখন একাধিক ব্যক্তি একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব সৃষ্টি হয়।

'Whenever two or more individuals come together and influence one another, they may be said to constitute a social group.'

Sheriff এবং Sheriff তাদের সংজ্ঞায় বলেছেন, 'গোষ্ঠী একটি সামাজিক একক, যা ব্যক্তি সমষ্টি নিয়ে গঠিত এবং যাদের মধ্যে নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থান ও সম্পর্ক থাকে। যদি গোষ্ঠীর একজন সদস্যও যদি গোষ্ঠীর মূল্যবোধ বা নিয়ম ভঙ্গ করেন, তাহলে সেটি পুরো গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করবে।'

'A social group is a social unit which consists of a number of individuals who stand in (more or less) definite status and role relationships to one another, and who possess a set of values or norms of its own regulating the behavior of individual members, at least in matters of consequence to the group.'

William বলেছেন, 'সামাজিক গোষ্ঠী হল এমন এক সমষ্টি, যারা পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত এবং একটি স্বীকৃত সংগঠনের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে।'

'A social group is a given aggregate of people playing inter-related roles and recognized by themselves or others as a unit of interaction.'

R. M. Maclver ও Page গোষ্ঠী শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাদের মতে, 'যে কোনো মানব সমষ্টি, যারা পরস্পরের সাথে সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে আবদ্ধ থাকে, তাকে গোষ্ঠী বলা হয়।'

'A social group is any collection of human beings who are brought into human relationship with one another.'

এসব সংজ্ঞার মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয় যে, সামাজিক গোষ্ঠী গঠন হয় যখন একাধিক ব্যক্তি একে অপরের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে, একে অপরকে প্রভাবিত করে এবং একটি নির্দিষ্ট আদর্শ বা নিয়মের অধীনে তাদের আচরণ পরিচালিত হয়। সামাজিক গোষ্ঠী একটি সংগঠিত কাঠামো, যা বিভিন্ন সদস্যের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আচরণের মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

৮.৪ সামাজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Social Group)

সামাজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল—

ব্যক্তি সমষ্টি (Collection of Individuals) : মানুষের সমাজজীবনের ভিত্তি হল গোষ্ঠীজীবন, ব্যক্তি সমষ্টি ছাড়া গোষ্ঠীজীবনের কোন অস্তিত্ব নেই। সুতরাং ব্যক্তি সমষ্টি হল গোষ্ঠীজীবনের মূল ভিত্তি।

গোষ্ঠীর সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক: গোষ্ঠী মাত্রই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে মিথক্রিয়া ও মতামতের

আদান প্রদান থাকবে। সেই সাথে থাকবে পরস্পরিক নির্ভরশীলতা, শুধুমাত্র সংখ্যা কোন গোষ্ঠী বানাতে পারে না। গোষ্ঠী পারস্পরিক আদান প্রদান ছাড়া কখনই তৈরি হয় না।

একাত্মবোধ (Feeling of Unity) : গোষ্ঠীজীবনের আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল গোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে ও গোষ্ঠীর সাথে একত্মবোধ। এই একাত্মবোধের জন্যই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক আদান প্রদান সম্ভব হয়।

পারস্পরিক সচেতনতা (Mutual awareness) : গোষ্ঠী জীবনে, প্রত্যেক সদস্যই অন্য সদস্যদের ইচ্ছা, প্রয়োজন, প্রত্যাশা সম্পর্কে অবগত থাকেন।

গোষ্ঠী চেতনা (Group Spirit) : গোষ্ঠী জীবনের অন্যতম মূল লক্ষ্য গোষ্ঠী চেতনা, সাধারণত প্রতিটি গোষ্ঠী একটি নির্দিষ্ট আদর্শ ও রীতিনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ও তাকে মেনে চলা গোষ্ঠী জীবনের লক্ষ্য। এই গোষ্ঠী মনোভাবের জন্য সভ্যগণ সংকীর্ণ ব্যক্তি স্বার্থের পরিবর্তে বৃহত্তর গোষ্ঠীস্বার্থকে প্রাধান্য দেয়।

গোষ্ঠীর সাধারণ ব্যবহার (Common Behaviour) : গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যই কম বেশি একইরকম সামাজিক ব্যবহার করে। এই একই ধরনের সামাজিক ব্যবহার গোষ্ঠী বানাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

সংগঠন (Organization) : সমাজজীবনে গোষ্ঠী একটি সংগঠিত অংশ বিশেষ। এটা কখনও কোন পরিস্থিতিতে অসংগঠিত নয়।

গোষ্ঠী নিয়ম (Group Norms Standard) : প্রতিটি সামাজিক গোষ্ঠী কিছু নিয়ম ও নীতি দ্বারা পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত, প্রতিটি গোষ্ঠী সদস্য সেই নিয়মের প্রতি দায়বদ ও গোষ্ঠী স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট হয়, সেই নিয়ম পালন করে।

সদস্যদের উপর নিয়ন্ত্রণ (Control Over Members) : গোষ্ঠী সদস্যদের সামাজিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে যাতে সামাজিক ব্যবহারের জন্য গোষ্ঠীর নিয়মশৃঙ্খলা, রীতিনীতি ব্যাহত না হয়। অসামাজিক ব্যবহারের জন্য গোষ্ঠীজীবনে বিচ্ছিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধের সৃষ্টি হয় যা সমাজ জীবনে ঐক্যের পথে বাঁধা তৈরি করে।

গোষ্ঠীর আয়তন (Size of the Group) : সমাজে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গোষ্ঠী থাকে যেমন, রাজনৈতিক দল, খেলাধুলার ক্লাব ইত্যাদি। গোষ্ঠী ভেদে তার আয়তনের ও তারতাম্য হয়। কেন গোষ্ঠী খুব ছোট হয়, দুই জন সদস্যও হতে পারে আবার কোন গোষ্ঠী এত বড় সে তার সদস্য সংখ্যা লাখের অধিক।

স্থায়িত্বকাল (Duration) : আয়তনের মত গোষ্ঠীর স্থায়িত্বে ও তারতম্য দেখা যায়। কোন কোন গোষ্ঠীজীবনের স্থায়িত্ব সাময়িক হয় আবার কেন কোন গোষ্ঠীজীবনের স্থায়িত্ব চিরকালীন হয়, যেমন পরিবার।

পরিবর্তনশীলতা (Changeability) : পরিবর্তনশীলতা সামাজিক গোষ্ঠীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য গোষ্ঠীর সাংগাঠনিক কাঠামো ও কর্মক্ষেত্রের পরিধি চিরকাল একরকম থাকে না। সমাজের অগ্রগতির সাথে তা পরিবর্তিত হয়।

৮.৫ সামাজিক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা (Social Group & Role of Education)

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তাই তারা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। সমাজ কোন স্থির বস্তু নয়, সমাজ গতিশীল, একটি সামাজিক, গতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজস্থ পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। সময় ও স্থানগত পরিবর্তন পারস্পরিক সম্পকের প্রকৃতি ও গভীরতার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। আবার প্রত্যেক সামাজিক গোষ্ঠী তার সদস্যদের মধ্যে গোষ্ঠীর সংহতি ও অখণ্ড সমগ্রতার সম্পর্কে একটি সামগ্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। সেই সর্থে গোষ্ঠী ভেদে, গোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, বিভিন্ন ছবি ফুটে ওঠে। কিন্তু বিভিন্ন গোষ্ঠী প্রত্যেকে একে ওপরের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। গোষ্ঠীকে পরিচালনা করতে এর প্রত্যেকটি সদস্যর ভূমিকা ও উপযোগিতা অপরিহার্য্য। শিক্ষা ও গোষ্ঠীজীবনের সম্পর্ক খুব নিকট। শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই গোষ্ঠীগুলি তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় ব্যপ্ত হয়। শিক্ষা আগামী প্রজন্মের মধ্যে শৃহলা, রীতিনীতির সঞ্চার ঘটিয়ে গোষ্ঠী চেতনার বিকাশ ঘটায়। শিক্ষা একদিকে যেমন ঐক্য ও সংহতির সৃষ্টি করে, অন্যদিকে তেমন শিশুমনকে সামাজিক ও গোষ্ঠী জীবনের আদর্শগুলিকে বহন করবার উপযোগী রূপে গড়ে তোলে, যাতে ভবিষ্যতে তারা সমাজ ও গোষ্ঠীজীবনের সদস্য হিসাবে গড়ে উঠে সমাজ ও গোষ্ঠীজীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা অর্জন করে।

৮.৬ সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে সামাজিক গোষ্ঠী সম্পর্কিত ধারণা, বৈশিষ্ট্য এবং শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সামাজিক গোষ্ঠী হল এমন একটি সংগঠন যেখানে একাধিক ব্যক্তি পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত এবং একে অপরকে প্রভাবিত করে। এটি সামাজিক কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা সামাজিক সম্পর্ক এবং আদান-প্রদানকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়। বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিকরা সামাজিক গোষ্ঠীকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, তবে সকলের মধ্যে একটি মূল ধারণা রয়েছে সামাজিক গোষ্ঠী হল এমন একটি সমষ্টি, যেখানে সদস্যরা পরস্পরের সাথে ক্রিয়াশীল সম্পর্কের মধ্যে থাকে এবং তাদের মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম ও মূল্যবোধ বিরাজমান থাকে।

গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: ব্যক্তি সমষ্টি, সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, একাত্মবোধ, গোষ্ঠী চেতনা, সাধারণ আচরণ, সংগঠন, গোষ্ঠী নিয়ম এবং নিয়ন্ত্রণ। সামাজিক গোষ্ঠী কখনোই একটি অনিয়ন্ত্রিত বা অগঠিত সমষ্টি নয়, বরং এটি একটি সুসংগঠিত অংশ, যা সামাজিক সম্পর্ক ও নিয়মের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

শিক্ষা সামাজিক গোষ্ঠীজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কারণ এটি সমাজের আদর্শ, মূল্যবোধ এবং রীতিনীতি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে প্রচার করে। শিক্ষা গোষ্ঠীর সংহতি এবং ঐক্য বৃদ্ধি করে, এবং সদস্যদের

গোষ্ঠীজীবনের সদস্য হিসেবে তৈরি করতে সাহায্য করে। এটি সমাজে সামাজিক সম্পর্কের গুণগত পরিবর্তন এবং অগ্রগতি সাধনে সহায়তা করে।

৮.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

১। সামাজিক গোষ্ঠী কী?

২। গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

৩। গোষ্ঠী এবং সমাজের মধ্যে সম্পর্ক কী?

৪। সামাজিক গোষ্ঠী গঠনের জন্য কি কি শর্ত প্রয়োজন?

৫। শিক্ষা সামাজিক গোষ্ঠীজীবনের ক্ষেত্রে কীভাবে ভূমিকা পালন করে?

৬। গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কীভাবে সমাজের গতিশীলতা বজায় রাখে?

৭। গোষ্ঠীর চেতনা বা গোষ্ঠী মনোভাব কী এবং এর গুরুত্ব কী?

৮। কীভাবে শিক্ষা গোষ্ঠীজীবনে সংহতি ও ঐক্য সৃষ্টি করে?

৯। সামাজিক গোষ্ঠীর নিয়ম এবং নীতিমালা কীভাবে সদস্যদের উপর প্রভাব ফেলে?

১০।গোষ্ঠী জীবনে নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব কী এবং এটি কিভাবে সমাজে স্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে?

৮.৮ অভিসম্বন্ধ (Reference)

Agarwal, J. C (2002) Theory and Principles of Education (13th ed.) New Delhi; Vikash Publishing House.

Bhatia, K & Bhatia, B. D (1992) Theory and Principles of Education (20th Ed) Delhi; Doaba House.

Bhattacharya, D. C (1996). Sociology (6th ed.) Cacutta Vijoya Publishing House.

Pandey, R.S (2009) Principals of Education (13th Ed) Agra-2, Agrawal Publications.

Ravi, S. S (2015) A comprehensive sudy of Education (2nd Ed) Delhi; PHI Learning Sharma, Y. K. (2016) Foundation in Sociology of Education, Delhi;

Saxena, N.R.S (2009) Principles of Education Meerut; Vinay Rakhija

Chandra, S., & Sharma, R. (2006). Sociology of Education.

একক ৯ ❑ সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ ও ভূমিকা : প্রাথমিক গোষ্ঠী, গৌণ গোষ্ঠী এবং নির্দেশক গোষ্ঠী (Types and roles of social groups : Primary, Secondary and Tertiary)

গঠন

৯.১ উদ্দেশ্য

৯.২ ভূমিকা

৯.৩ সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ

৯.৪ প্রাথমিক গোষ্ঠী

৯.৫ গৌণ গোষ্ঠী

৯.৬ নির্দেশক গোষ্ঠী

৯.৭ সারসংক্ষেপ

৯.৮ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

৯.৯ অভিসম্বন্ধ (Reference)

৯.১ উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের সামাজিক গোষ্ঠী ও তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গভীর ধারণা প্রদান।

- প্রাথমিক গোষ্ঠী ও গৌণ গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য বুঝানো।
- গোষ্ঠী সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, উদ্দেশ্য এবং সদস্যদের আচরণ কিভাবে গোষ্ঠীর গঠন ও কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে তা বিশ্লেষণ করা।
- সামাজিক গোষ্ঠীর প্রভাব এবং সমাজে এর ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা।

৯.২ ভূমিকা

মানব সমাজে সামাজিক গোষ্ঠী একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান অধিকার করে। প্রতিটি ব্যক্তি তার জীবনে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর অংশ হয়ে থাকে, যেমন পরিবার, বন্ধু মহল, কর্মস্থল বা রাজনৈতিক দল। এই গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে ব্যক্তি তার পরিচয়, আচার-আচরণ এবং সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। গোষ্ঠীগুলির

মধ্যে প্রধানত দুই ধরনের গোষ্ঠী দেখা যায়: প্রাথমিক গোষ্ঠী এবং গৌণ গোষ্ঠী। প্রাথমিক গোষ্ঠী গঠিত হয় কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং আত্মিক সম্পর্কের মাধ্যমে, যেখানে গৌণ গোষ্ঠী গঠিত হয় বৃহত্তর সামাজিক বা অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য।

৯.৩ সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, তাই সে একসাথে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর অংশ। সামাজিক গোষ্ঠী বলতে ব্যক্তি সমষ্টিকে বোঝায়। পরিবার, গ্রাম, জাতি রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংঘ প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠীর উদাহরণ, গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্য পরস্পরের সাথে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, এমনকি দুইজন ব্যক্তি সম্মলিত হয়েও সামাজিক গোষ্ঠী তৈরি করতে পারে। প্রতিটি সামাজিক গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট একটি সামাজিক উদ্দেশ্য থাকে। শুধু তাই নয়, প্রতিটি গোষ্ঠীর একটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক চেতনা থাকে। গোষ্ঠী মনোভাবের জন্য সদস্যগণ ব্যক্তিস্বার্থের পরিবর্তে গোষ্ঠীস্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। গোষ্ঠীর সদস্যগণ গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার তাগিদে এবং অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকেন ফলে তাদের মধ্যে ভাতৃত্ববোধ ও একাত্মবোধের সৃষ্টি হয়, যা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কল্যাণকর ও মঙ্গলকর।

মানুষের মিলিত ও এক হবার মূল লক্ষ্য হল সংঘবন্ধ হওয়া। গোষ্ঠীর অস্তিত্ব তৈরি হওয়ার মূল কারণ হল, গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্য এক লক্ষ্য ও এক ইচ্ছা প্রতিপালন করে নিজেদের গোষ্ঠীজীবনে। প্রতিটি গোষ্ঠী সদস্যের ব্যবহার ও ক্ষমতাকেই গোষ্ঠীর কায়া ও আকার তৈরি করে, যে গোষ্ঠীর তারা হন সদস্য। শুধু তাই নয়, শৈশব থেকেই গোষ্ঠীজীবনের মাধ্যমে মানব শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকশিত ও প্রকাশিত হয়ে ওঠে। যে কোন ব্যক্তি তার জীবনকালে বিভিন্ন গোষ্ঠীর অংশ হয়ে ওঠে সেই গোষ্ঠীগুলিকে সে হয় পছন্দ করেছে বা হয়ত জন্মসূত্রে অর্জন করেছে।

জটিল সামাজিক কাঠামোর সরলতম একক হল সামজিক গোষ্ঠী। সামাজের অবেচ্ছদ্য অংশ হল গোষ্ঠী। দুই বা ততোধিক মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আদান প্রদানের মাধ্যমে গোষ্ঠী তৈরি হতে পারে। প্রতিটি গোষ্ঠীর একটি নির্দিষ্ট সামাজিক লক্ষ্য থাকে। গোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্যদের মধ্যে সাধারণভাবে আলাপ পরিচয় ও ভাবের আদান প্রদান ঘটে এবং পরস্পরিক সম্পর্কে অবস্থা হয় ও তার ফলে গোষ্ঠীস্বার্থ সুরক্ষিত হয়। এইভাবে সামাজিক গোষ্ঠী সদস্যদের মধ্যে আমরা দেশ গড়ে ওঠে।

গোষ্ঠী তৈরি হয় ব্যক্তি সমষ্টি দিয়ে, কিন্তু ব্যক্তি সমষ্টি মানেই গোষ্ঠী নয়, যদি ব্যক্তি সমষ্টির মধ্যে পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান না থাকে তহলে, তারা গোষ্ঠী নয়। আমরা রেলস্টেশনে, বাসস্ট্যান্ডে মানুষের সমাবেশ দেখি, কিন্তু তারা গোষ্ঠী তৈরি করে না, কারণ তাদের মধ্যে ভাবের পারস্পরিক আদান প্রদান নেই। প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে গোষ্ঠী ২ পারিবারিক নৈকট্য বা যোগাযোগ ঘটায় না, গোষ্ঠী তার সদস্যদের মধ্যে গোষ্ঠীর সংহতি ও অখন্ডতা সম্পর্কে সামগ্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়, সদস্যগণ সংকীর্ণ ব্যক্তি স্বার্থের পরিবর্তে বৃহত্তর গোষ্ঠী স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়।

এই একাত্মবোধ, পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে যদিও তারা একই পরিবারের সদস্যও না হন। যেমন ধর, আমরা নিজেদের পরিচয় দিই ভারতবাসী বলে, কিন্তু তুমি কি খেয়াল করে দেখেছো, ভারতবর্ষের কতজন মানুষকে আমরা চিনি। William বলেছেন 'A social group is a given aggregate of people playing inrerrelated roles and recognized by themselves or others as a unit of interaction'.

সমাজতত্ত্বের দিক থেকে Mokee গোষ্ঠীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছে, 'A plurality of people as actors involved in a pattern of social interaction, concious of sharing common under-standing and of accepting some rights and obligations that accrue only to members.'

আবার Green বলেছেন, 'A group is an aggregate of individuals which persist in time, which has one or more interests and activities in common and which is organized.'

Macver এবং Page গোষ্ঠী শব্দটিকে ব্যপক অর্থে ব্যবহার করেছেন, 'Any Collection of human beings who are brought into social relationship with one another', সদস্যদের চেতনার মধ্যে সামাজিক গোষ্ঠীর মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকে যা সামাজিক একাত্মবোধের উন্মেষ ঘটায়। সেই হিসাবে, সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্কে আবন্দ ব্যক্তি সমষ্টিকে সামাজিক গোষ্ঠী বলা হয়। এরা পরস্পরের সাথে সামাজিক বন্ধনের সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। তাদের লক্ষ্য ও লক্ষ্য পূরণের রাস্তা হিসাবে সামাজিক ব্যবহার এক রকম হয়। এইভাবে দেখতে গেলে, পরিবার, দেশ, রাজনৈতিক, দল, বা একটি শ্রমিক কল্যাণ সমিতি প্রত্যেকেই এক একটি সামাজিক গোষ্ঠী।

সুতরাং, সামাজিক গোষ্ঠী বলতে বোঝায়, যখন ব্যক্তি সমষ্টি সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত হয়ে পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্কে আবঙ্গ থাকে। মানবসমাজে এইরকম আরেক ধরনের গোষ্ঠী বর্তমান আছে, যাদের ঠিক সামাজিক গোষ্ঠী বলা যায় না। সাধারণত এই ধরনের ব্যক্তিরা সম ব্যবসায়, বা বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিসমূহ অথবা সম আয়ের ব্যক্তিসমূহকে নিয়ে এই ধরনের গোষ্ঠী গড়ে উঠতে পারে, এদের সাধারণ আপাত গোষ্ঠী বলা হয় (Aggregates / Quasi Groups) এই ধরণের গোষ্ঠী সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে গড়ে উঠতে পারে, যদি তার পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত হন ও একই লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে ধাবিত হন।

মানবসমাজে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীর রকমভেদ দেখা যায়। সেগুলি হল, প্রাথমিক গোষ্ঠী (Primary Group), Secondary (গৌণ গোষ্ঠী) (Voluntary and involuntary group) ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক গোষ্ঠী এবং এইরকম আরও অনেক। সমাজতত্ত্ববিদ্যা সমাজকে ভাগ করেছেন তার আকার অনুযায়ী, কখনও বা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, কখনও বা তার স্থায়িত্ব, নৈকট্য, সাংগঠনিক প্রকারভেদ বা পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে।

৯.৪ প্রাথমিক গোষ্ঠী (Primary)

দুটি গোষ্ঠী কখনই এক হয় না, প্রতিটির নির্দিষ্ট লক্ষ্য, নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতি ও নিয়মকানুন প্রভৃতি থাকে। সমাজতত্ত্ববিদরা গোষ্ঠীকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন। তার মধ্যে প্রাথমিক গোষ্ঠী হল অন্তরঙ্গ সংগঠন।

প্রাথমিক গোষ্ঠীর উদাহরণ হিসাবে অনু পরিবার (Nuclear Family) কে দেখানো হয়, কিন্তু এটাই একমাত্র প্রাথমিক গোষ্ঠীর উদাহরণ নয়। প্রাথমিক গোষ্ঠী হল অল্প সংখ্যক মানুষের সংগঠন। সদস্যদের মধ্যে গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। তাদের সম্পর্কের মূলে আছে প্রত্যক্ষ পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এই সম্পর্ক হয় দীর্ঘমেয়াদী। গোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্য প্রত্যেকের সাথে আত্মিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। প্রাথমিক (Primary) শব্দটি তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের মূল কারণ হচ্ছে এই গোষ্ঠী সার্বিক ও সামাজিকরণের সমস্ত স্তরে এই গোষ্ঠীর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। মানব প্রকৃতির ভালোবাস, নিরাপত্তা এবং বন্ধুত্ব দ্বারা প্রাথমিক গোষ্ঠীর ভিত্তি তৈরি হয়। প্রাথমিক গোষ্ঠীর কাছ থেকেই তার নবীনতর সদস্যরা গোষ্ঠীর আচার-আচারণ, নিয়ম-কানুন শেখে, শেখে নিয়মবর্তিতা পালন করে কিভাবে পরিবারের ও বন্ধুদের সাথে একাত্ম হয়ে উঠতে হয়।

মার্কিন সমাতত্ত্ববিদ Charles Horfon Cooley উঁর বই 'Social Organization' সর্বপ্রথম প্রাথমিক গোষ্ঠী সম্বন্ধে আলোকপাত করেন ১৯০৯ সালে। যদিও 'গৌণ গোষ্ঠী' শব্দটি কুলি তাঁর বইতে উল্লেখ করেননি। কিন্তু যখন প্রাথমিক গোষ্ঠীবাদে সমাজে অবস্থিত অন্যান্য গোষ্ঠী নিয়ে কিছু সমাজবিদ আলোচনা শুরু করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হল— K. Davis, Ogburn এবং Mclver তাঁরাই গৌণ গোষ্ঠী শব্দটি ব্যবহার করে তার প্রাধন্য নিয়ে আলোচনা করেন। সুতরাং সহজেই বলা যায়, প্রাথমিক ও গৌণ গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য করা হয় তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নৈকট্যের পরিমাণ ও সংগঠনের প্রকৃতির ও সদস্য সংখ্যার উপর ভিত্তি করে।

প্রাথমিক গোষ্ঠী সবথেকে সরল ও সর্ববিদিত সামাজিক সংগঠন। সমস্ত ধরনের সামাজিক সম্পর্কের অনুরূপ এই সংগঠনের অস্তিত্ব সর্ববিদিত। প্রাথমিক গোষ্ঠী অল্পসংখ্যক মানুষের সংগঠন এবং প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে এই গোষ্ঠীর ভিত তৈরি হয়। তাদের এই সম্পর্কের মূলে আছে মুখোমুখি বা প্রত্যক্ষ পরিচয়, যা গভীর ও নিবিড়। প্রত্যক্ষ ও মুখোমুখি সম্পর্কের মূলে আছে পারস্পরিক সহযোগিতা, নির্ভরশীলতা বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক আদান প্রদান, তারা নিজেরা পরস্পরের চিন্তার মধ্যে থাকে। গোষ্ঠীটা খুব অল্প সংখ্যক সদস্য দ্বারা তৈরি হলেও তার পরস্পরের সাথে বসবাস করে।

প্রাথমিক গোষ্ঠী বিষয়ে কুলি বলেছেন: 'By primary groups I mean those characterized by intimate face to face association and cooperation. they are primary in several senses, but chiefly in that they are fundamental in framing the social nature and ideal,

of the individual', এই ধরনের গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে কুলি একধরনের প্রবাদ ব্যবহার করতেন 'The nursery of human nature' যেখানে পারস্পরিক সহযোগিতা, অনুভূতি, বিশ্বস্ততা, পরস্পরের জন্য উদ্বেগ ইত্যাদি শেখা যায়। প্রাথমিক গোষ্ঠীর উদাহরণ হিসাবে কুলি যাদের তুলে ধরছেন তারা হল পরিবার, উপজাতি, বংশ, খেলার গোষ্ঠী, কথ চাল চলি গোষ্ঠী, আত্মীয় ইত্যাদি। সকল সংগঠন ও সামাজিক কাঠামোর কেন্দ্রীয় অংশ হল মানবসমাজের এই প্রাথমিক গোষ্ঠী সর্বদাই 'প্রথম'। 'It is the first and generally remains the chief focus of our social satisfactions'.

৯.৪.১ প্রাথমিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a Primary Group)

প্রাথমিক গোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১. দৈহিক নৈকট্য (Physical Proximity / Closeness)

ব্যক্তিগত সান্নিধ্য সদস্যদের ভাব-ভাবনা, মতামতেদির পারস্পরিক আদান প্রদানকে সহজতর করে তোলে। এর ফলে গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে এক আত্মীয়তার মনোভাব গড়ে ওঠে।

পারস্পরিক সাক্ষাৎ ও কথোপোকথন সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দৈহিক নৈকট্য বা ব্যক্তিগত সান্নিধ্য, চিন্তা -ভাবনা ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ককে আরোও সহজতর করে তোলে। এতদসত্ত্বেও দৈহিক নৈকট্যকে একেবারে অপরিহার্য উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। প্রফেসর K. Davis বলেছেন ব্যক্তিগত সান্নিধ্য ব্যাতিরেকেও মুখোমুখি সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, অপরে সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি সম্পর্ক হয় কিন্তু অন্তরঙ্গতা তৈরি হয় না। আবার অপরদিকে যোগাযোগ যেমন ফোন, চিঠি ইত্যাদির মাধ্যমে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি হয়, যদিও তাদের সাথে বছরের পর বছর কোন সাক্ষাৎ হয় না।

২. গোষ্ঠীর সীমিত আয়তন (Smallness)

সাধারণত প্রাথমিক গোষ্ঠী আয়তনে ক্ষুদ্র হয়। ক্ষুদ্র অয়তনের জন্য গোষ্ঠী সচেতনা ও অন্তরঙ্গতা তৈরি হয়। গোষ্ঠীর আয়তন ক্ষুদ্র হলে সম্পর্ক গভীর হয়। গোষ্ঠীর আয়তন বিশাল হলে সম্পর্ক ক্ষীণ হয়। গোষ্ঠীর অকার ক্ষুদ্র হবার জন্য, সমস্ত গোষ্ঠীর সদস্যরা সম্মিলিতভাবে কাজ করার চেষ্টা করে এবং তাদের দ্রুত গোষ্ঠী চেতন ও গভীর অন্তরিকভাবে সৃষ্টি হয়।

৩. গোষ্ঠীকন্ধনের স্থায়িত্ব (Durability)

সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পরস্পরিক সম্পর্কের আন্তরিকতা ও গভীরতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ এর পৌণঃপুণিকতা ও স্থায়িত্বের উপর নির্ভরশীল, সদস্যদের সাক্ষাৎ, মেলামেশা যত বেশি ঘন ঘন হয়, সম্পর্ক ও ততবেশি স্থায়ী হয়। অবার, গোষ্ঠীগত ঐক্যের স্থিতিকালও দীর্ঘতর হয়ে তাকে সদস্যগণের মধ্যে আবেগ, অনুভূতি, ভাবপ্রবণতা প্রভৃতি কারণে।

৪. উদ্দেশ্যের অভিন্নতা (Identity of Ends)

প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যগণ উদ্দেশ্য ও মনোভাবের দিক থেকে অভিন্ন প্রকৃতির হয়। তাদের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও মনোভাবের ক্ষেত্রে সমতা পরিলক্ষিত হয়। গোষ্ঠীর সকলেই সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উদ্যোগী হয়ে থাকেন। প্রতিটি গোষ্ঠী সদস্যের শুভ-অশুভ, কল্যাণ-অকল্যাণ হল অন্য সকলের চিন্তনীয় বিষয়। সদস্যদের উদ্দেশ্যের সমতা গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তিত্বের এক মনস্তাত্ত্বিক সমাহার সৃষ্টি করে। Davis এর মতে 'The child's needs becomes the mother's end'.

৫. সম্পর্ক নিজেই শেষ হয়ে যায় (Relationship is an end in itself)

প্রাথমিক গোষ্ঠীর সম্পর্ক সাধারণ শেষ হবার জন্য তৈরি হয় না। কিন্তু প্রাথমিক সম্পর্ক তৈরি করার ভিত্তি যদি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়। তাহলে সেই সম্পর্ককে সঠিক বলে গ্রহণ করা হয় না। সত্যিকারের সম্পর্ক, কখনই উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে গড়ে ওঠে না। এই সম্পর্ক উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে তৈরি হয়। এই সম্পর্কের মধ্যে কোন স্বার্থপরতা থাকে না। বন্ধুত্ব, সম্পর্ক আনন্দের উৎস যা অন্তর থেকে অনুভব করতে হয়।

৬. সম্পর্কগুলি ব্যক্তিগত (Relationship is Personal)

প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে যে পরস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান থাকে তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। এই সম্পর্ক কেই সদস্যদের মধ্যেই তৈরি হয় ও তাদের সম্পর্কের সাথে টিকে থাকে। দুই সদস্যের যে কোন একজনের অনুপস্থিতিতে সেই সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। এই ব্যক্তিগত সম্পর্ক শুধু মাত্র কেই দুইজন ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে ও তাদের সাথেই শেষ হয়। সেই সম্পর্ক যাদের দ্বারা তৈরি, করো একজনের অনুপস্থিতি অন্যজন দ্বারা পুরণ হয় না। ধরা যাক দুই বন্ধুর মধ্যে সম্পর্ক, এক বন্ধু মারা গেল। সেই বন্ধুর মারা যাওয়ার সাথে সাথে সেই সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। কেউ তার জায়গা নিতে পারে না বা তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে না।

৭. ব্যাপক সম্পর্ক (Relationship is Inclusive)

প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেই সম্পর্ক সার্বিক ও বিশেষভাবে ব্যাপ্ত। গোষ্ঠীভুক্ত সকল সদস্যকে পুরোপুরি আবদ্ধ করে প্রাথমিক সম্পর্কের ব্যাপ্তি। বাস্তবে এই ধরনের সম্পর্ক সৃষ্টির মূলে আছে নিবিড় ও দীর্ঘস্থায়ী যোগাযোগ। সুতরাং প্রাথমিক গোষ্ঠীর সম্পর্কগুলো হয় স্বতঃস্ফূর্ত, যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের থেকে সম্মিলিত স্বার্থের প্রাধান্য বেশি হয়। কেন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সম্পর্ক তৈরি হয় না।

৯.৪.২ মানবসমাজে প্রাথমিক গোষ্ঠীর গুরুত্ব (Importance of Primary Group)

প্রাথমিক গোষ্ঠী মানবসমাজে ও ব্যক্তির জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের

বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে অবস্থিত সমস্ত মানুষের সামাজিক সত্তা এই গোষ্ঠীগুলিই গঠন করে। প্রাথমিক গোষ্ঠী মানুষের সত্তাকে প্রতিপালন করে। ব্যক্তিসত্তার 'আমি' (self) গড়ে ওঠে গোষ্ঠীর সাথে নিবীড়, ঘনিষ্ঠ ও আদর্শ মূল্যবোধ আয়ত্তকরণের মাধ্যমে।

শিশু তার জন্মানোর সাথে সাথে নিজের পরিবারের সদসাদের আচরণ আয়ত্ত করতে থাকে। সমাজ স্বীকৃত আচার আচরণ, আদব-কায়দা, আদর্শ মূল্যবোধ, ন্যায়-অন্যায়, ও চিত্য-অনৌচিত্যের ধারণা আয়ত্ত করতে থাকে। শিশু এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কিত ধারণা আয়ত্তে আনে তার পরিবার, খেলাধূলার সঙ্গী-সাথী, সমবয়সীদের গোষ্ঠী প্রভৃতি প্রাথমিক গোষ্ঠীদের মাধ্যমে। খেলার সঙ্গী সাথীরা তাকে শেখার কিভাবে সে তার সমবয়সীদের সাথে মিশবে। একসাথে কাজ করবে, প্রতিযোগিতা করবে কখনও কখনও সংগ্রামও করবে। পরিবার সামাজিকীকরণের কাজ করে। সেই কারণে পরিবারকে সমাজের স্তম্ভ বলা হয়। এবং খেলার গোষ্ঠীকে ভবিষ্যতের নাগরিক তৈরির মাধ্যম বলা হয়। প্রাথমিক গোষ্ঠী শুধু মানুষের চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করে না, প্রতিটি সদস্যকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের ইচ্ছাকে ছুতে। মুখোমুখি ও ঘনিষ্ঠ পরিমণ্ডল প্রাথমিক গোষ্ঠীর থাকায়। প্রাথমিক গোষ্ঠী বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার সদস্যদের উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করে এবং নিয়মানুবর্তীতাও নিপুণ করে তোলে। জীবনের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ও উদ্দেশ্য সাধানের ক্ষেত্রে, প্রাথমিক গোষ্ঠী সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করে। ব্যক্তি বর্গের মধ্যে এই বোধ সঞ্চারিত হয় যে, কোন উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে সে একেবারে একা নয়, তার পাশে আরোও অনেকে আছে। ম্যাকাইভার ও পেজ 'Society' নামক গ্রন্থে বলেছেন, 'Through participation the interest gains a new objectivity. We see it through the eyes of oth-ers, and thus it is in some measure freed from irrelevant personal implications.

সামাজিক দৃদ্ধিকোণ থেকে (Social point of view)

প্রাথমিক গোষ্ঠী শুধুমাত্র সামাজিকীকরণ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়, তারা সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক গোষ্ঠী সামাজিক বিধি আরোপনের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে। এটা শুধু গোষ্ঠী সদস্যদের নিরাপত্তা দেয় না তার সাথে সাথে তাদের সামাজিক ব্যবহার ও নির্দিষ্ট করে ও সম্পর্কের মধ্যে সুনির্দিষ্ট নিয়মের ব্যবস্থা করে।

প্রাথমিক গোষ্ঠী যেমন পরিবার, খেলাধূলার সঙ্গী সাথী, সামাজিকীকরণের ভূমিকা পালন করে। এই গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমেই সামাজিক রীতিনীতি, সভ্যত সঞ্চালিত হয়। তারাই শিশু বা গোষ্ঠী সদস্যকে সমাজের সুনির্দিষ্ট আচরণ বিধি শেখায়। প্রাথমিক গোষ্ঠীতেই গোষ্ঠীসদস্য স্নেহ, মায়া, মমতা, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা প্রভৃতির সন্ধান পায়। ফলে শিশু ক্রমশ সমাজের দায়িত্ববান সদস্য হয়ে ওঠে। প্রাথমিক গোষ্ঠী তার সদস্যদের সফলভাবে সামজিক প্রেক্ষাপটে কাজকরার প্রয়োজনীয় উৎসাহ প্রদান করে। এইভাবে প্রাথমিক গোষ্ঠী সমাজকে সঠিকভাবে চলতে সাহায্য করে ও তার গতিশীলতা বজায় রাখে। 'It is the first and generally remains the chief focus of our social satisfaction.'

৯.৫ গৌণ গোষ্ঠী (Secondary Group)

আধুনিক সমাজে গৌণ গোষ্ঠীর প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সময়ে এই গোষ্ঠী সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। সমাজের পরিধি ও জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে মানুষ বৃহত্তর গোষ্ঠীগুলোর প্রয়োজন অনুভব করে এবং সে অনুযায়ী বড় আকারে গোষ্ঠী গড়ে তোলে, যা বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে চলে। এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সদস্যদের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক বা ঘনিষ্ঠতা থাকে না। এ ধরনের গোষ্ঠীকে গৌণ গোষ্ঠী বলা হয়। গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যরা একে অপরের সাথে পরোক্ষভাবে, দূরবর্তী সম্পর্কের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। K. Davis বলেছেন, 'গৌণ গোষ্ঠীকে সহজভাবে বলা যেতে পারে, যা মূলত সব কিছুই উল্টো যা পূর্বে প্রথমিক গোষ্ঠী সম্পর্কে বলা হয়েছে।'

গৌণ গোষ্ঠীকে সাধারণত 'বিশেষ স্বার্থ গোষ্ঠী' বা 'স্বার্থ গোষ্ঠী' বলা হয়, যেমন রাজনীতিক দল, পৌরসভা, শ্রমিক সংঘ ইত্যাদি। এই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে মানবিক সংযোগ অস্পষ্ট এবং অস্থির। এসব সম্পর্ক সাধারণত সীমিত এবং পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত থাকে না। গোষ্ঠীর মোট সদস্যদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় থাকে। গৌণ গোষ্ঠীতে, সদস্যরা পরোক্ষভাবে একে অপরকে প্রভাবিত করতে পারে এবং সহকর্মীদের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্কও খুবই সীমিত।

বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক গৌণগোষ্ঠীর বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন—

C. H. Cooley এর মতে 'Secondary groups are wholly lacking in intimacy of association and usually in most of the other primary and quasi primary characteristic'.

Ogbourm এবং Nimkoft এর মতে, 'The groups which provide experience lacking in intimacy are called secondary groups'.

Kingsley Davis বলেছেন 'Secondary groups can be roughly defined as the opposite of everything said about primary group'.

Robert Bierstedt বলেছেন, 'Secondary are all those that they are not primary'.

৯.৫.১ গৌণ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Secondary Group)

১. বৃহৎ আকৃতি (Large in Size)

গৌণ গোষ্ঠীর আয়তন তুলনামূলকভাবে বৃহৎ হয়। স্বভাবতই এই সমস্ত গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যাও অধিক হয়। কেন একটি গৌণ গোষ্ঠীর পরিধি বিশ্বজুড়েও হতে পারে। যেমন— রেড ক্রস সোসাইটি, রেটারি ক্লাব, লাইন্স ক্লাব ইত্যাদি। এরূপ গোষ্ঠী আকৃতিতে বড় কিন্তু প্রকৃতিতে কৃত্রিম হয়।

২. পরোক্ষ সম্পর্ক (Formality)

গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পরস্পরিক সম্পর্ক আন্তরিক নয়, পরোক্ষ। এরা প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মত প্রাথমিক প্রভাব বিস্তার করে না। এর আনুষ্ঠানিক নিয়ম ও সাংবিধানিক রীতিনীতি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়। সমষ্টিগত চেতনার পরিবর্তে স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রাধান্য বেশি দেখা যায়। আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ম যেমন আইন, আদালত, পুলিশ ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের জন্য। নৈতিক নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র গৌণ। এই গোষ্ঠীতে মানুষ নিয়মনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, মানব সত্তার ভূমিকা নেই বললেই চলে।

৩. নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্ক (Impersonality)

গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যর মুখোমুখি প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে তৈরি হয় না। এবং এই কারণে গোষ্ঠীর সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক বা অন্তরঙ্গ হতে পারে না। গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক হল পরোক্ষ ও বাহ্যিক। K. Davis বলেছেন 'the touch and go variety' তাই এই সম্পর্ক নৈর্ব্যক্তিকও বটে। গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল নির্দিষ্ট বা বাঞ্ছিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া। ব্যক্তিগত পরিচয়ের জন্য বা সান্নিধ্যলাভের জন্য সদস্যরা গৌণ, গৌষ্ঠীতে সমবেত হয় না। তাই এই ধরনের গোষ্ঠীতে সম্পর্কের ব্যাপ্তি থাকে না। এবং এখানে স্বতন্ত্র্যবোধের প্রাধাণ্য পরিলক্ষিত হয়। সমষ্টিগত চেতনার বিষয়টি উপেক্ষিত।

৪. সহযোগিতার পরোক্ষ প্রকৃতি (Indirect Cooperation)

গৌণগোষ্ঠীগুলির অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সহযোগিতার পরোক্ষ প্রকৃতি। বৃহৎ সংগঠন গুলিতে মানুষ স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন কার্য সম্পাদন করে।

৫. সদস্যপদ স্বেচ্ছাধীন (Voluntary Membership)

গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যপদ সাধারণ বাধ্যতামূলক নয়, এই সদস্যপদ ঐচ্ছিক। অধিকাংশ গৌণ গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এ ধারণা প্রযোজ্য। যেমন রেডক্রস-এর সদস্য কেউ হতে বাধ্য নন।

৬. ব্যক্তির মর্যাদা ভূমিক নির্ভর (Status Depends upon Role)

গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মর্যাদা তাদের ব্যক্তিগত বা জন্মগত গুণাবলীর উপর নির্ভরশীল নয়। এই মর্যাদা নির্ভর করে তাদের ভূমিকার উপর। উদাহরণ হিসাবে, কোন শ্রমিক সংঘের সভাপতির মর্যাদার কথা বলা যায়। তিনি সংঘে কি ভূমিকা পালন করেন তার উপর নির্ভর করে তার মর্যাদা।

৯.৫.২ গৌণ গোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা (Importance of Secondary Group)

গৌণ গোষ্ঠীগুলি বর্তমান আধুনিক সভ্য সমাজে ও শিল্প এক প্রভাবশালী জায়গা দখল করে রেখেছে। যে সমাজে জীবন তুলনামূলকভাবে সহজ বা যেখানে মানুষের সংখ্যা কম, সেখানে প্রাথমিক গোষ্ঠীর

যথেষ্ট গুরুত্ব বিদ্যমান। কিন্তু সমাজে চাহিদা বারার সাথে সাথে শ্রমের বিভাজনের ফলে গৌণ গোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। ছোট ছোট সম্প্রদায়ের জায়গায় বড় সম্প্রদায়গুলি কেই স্থান দখল করেছে। কুটির শিল্পের পরিবর্তে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে। জনসংখ্যা গ্রাম থেকে শহরে চলে আসছে। আধুনিকতার পরিবর্তনশীলতার সমাজের প্রাথমিক দলগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। মানুষ এখন গৌণ গোষ্ঠীগুলির উপর বেশি নির্ভরশীল, তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য। শিশুরা আগে পরিবারের পরিবেশে জন্মগ্রহণ করত, কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেক শিশু হাসপাতালের ঠান্ডা পরিবেশে জন্ম নেয়।

৯.৫.৩ নিম্নোক্ত হল গৌণগোষ্ঠীর সুবিধা (Advantages of Secondary Group)

১. দক্ষতা (Efficiency)

মানবসমাজে কার্যধারার উন্নতিসাধনের ক্ষেত্রে গৌণ গোষ্ঠীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এবং এইসব গোষ্ঠীর মাধ্যমে কর্মনিপুণতা বৃদ্ধি পায়। এই সমস্ত গোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনা, তদারকি ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকে একটি কর্তৃপক্ষ, এই সমস্ত গোষ্ঠীতে কার্য সম্পাদনার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এখানে কর্ম পদ্ধতির উন্নতি ও নিপুণতা বৃদ্ধির ব্যাপারে চেষ্টা করা হয়। গৌণ সম্পর্ক হয় নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনে সহায়ক। এই অর্থে গণ্য করা যেতে পারে, তারা চরিত্রে কার্যকরী।

২. সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গিকে উদার করে (Wider Outlook)

গৌণ গোষ্ঠী আকার আয়তনে অধিকতর বৃহৎ ও ব্যাপক হয়ে থাকে। দুনিয়া জুড়ে এদের পরিধি পরিব্যাপ্ত, এই সমস্ত গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে থাকে বিশ্বের বিভিন্ন মানুষ, এবং এই সমস্ত কিছুর সামগ্রিক ফলশ্রুতি হিসাবে আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা, জাতপাতের বিচার প্রভৃতি সঙ্কীর্ণতার অশুভ প্রভাব থেকে গোষ্ঠী জীবন মুক্ত থাকে। স্বভাবতই গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গীতে তাকে উদারতা।

৩. বিস্তৃত সুযোগ (Wider Oppertunity)

সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে বিভিধ প্রকারের সুযোগ সুবিধার দ্বার মুক্ত করে দিয়েছে এই সমস্ত গৌণ গোষ্ঠী, পূর্বে বৃত্তির ক্ষেত্রে মানুষের সুযোগ-সুবিধা ছিল একেবারেই সীমিত। অতীতে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ প্রধানত কৃষিকার্য, ও ছোটো খাটে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। সেই সময় কাজকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল মানুষের বৈষয়িক কাজকর্ম। বর্তমানে কিন্তু ব্যক্তির সম্মুখে বহু ও বিভিন্ন বিচিত্র সুযোগ উপস্থিত হতে দেখা যায়। এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা ছড়িয়ে থাকে শিল্প বাণিজ্য, করিগরি ও অপর পর নানা ক্ষেত্রে এবং এই সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে একজন মানুষ অখ্যাত অবস্থা থেকে খ্যাতিমান অবস্থায় উপনীত হতে পারে। মানুষ দিন দিন এই দলের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। আধুনিক বিশ্বে বস্তুগত স্বাচ্ছাদ্য এবং আয়ুর ক্ষেত্রে অসাধারণ অগ্রগতি উত্থান বা লক্ষ্য নির্দেশিত গৌণ গোষ্ঠী ছাড়া অসম্ভব হবে।

৯.৫.৩ প্রাথমিক গোষ্ঠী ও গৌণ গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য:

প্রাথমিক ও গৌণ গোষ্ঠীএই দুই ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। কুলি প্রথমে এই বিভাজন উপলব্ধি করেছিলেন, তবে তিনি এটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। যাই হোক, প্রাথমিক ও গৌণ গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে।

১. আকৃতিগত পার্থক্য: (Size)

আকার আয়তনগত বিচারে প্রাথমিক গোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির হয়। এই ধরনের গোষ্ঠী গঠিত হয় বিশেষ একটি এলাকার স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির সম্বন্বয়ে। অপরদিকে গৌণ গোষ্ঠীসমূহ আকারে আয়তনে অপেক্ষাকৃত বৃহদকারবিশিষ্ট হয়। এই সমস্ত গৌণ গঠিত হয় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বহুসংখ্যক মানুষের সম্বন্বয়ে।

২. শারীরিক নৈকট্য (Physical Proximity)

প্রাথমিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের উপর ভিত্তি করে। এই গোষ্ঠীর লোকেরা কেবল একে অপরকে মানে না, তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে। এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগই শক্তিশালী মানসিক বন্ধনে তাদের আবদ রাখে। গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ নৈকট্যের সম্পর্ক বিরাজ করে না। গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পরোক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ নির্দিষ্ট কাজ করে ও নির্দিশ পালন করে। এর অর্থ হল, গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার তাগিদে প্রত্যেকে স্ব স্ব ভূমিকা স্বতন্ত্র্যভাবে সম্পাদন করে।

৩. সময়কাল (Duration)

প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি দীর্ঘসময়ের জন্য বিদ্যমান। প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির সম্পর্ক স্থায়ী প্রকৃতির হয়। অন্যদিকে গৌণ গোষ্ঠীর সম্পর্কগুলি অস্থায়ী সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ক্লাবের সদস্যরা ঘন ঘন আসে এবং কয়েক ঘণ্টার জন্য থাকে।

৪. সহযোগিতার প্রকার (Kinds of Cooperation)

প্রাথমিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যরা পরস্পরের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করে থাকে। প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের ওঠাবসা, আলাপ-আলোচনা, খেলাধূলা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ সবই একসাথে সম্পাদিত হতে দেখা যায়। পক্ষান্তরে গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা হল পরোক্ষ প্রকৃতির। অভিন্ন স্বার্থের উপর ভিত্তি করে স্বীকৃত কোন সাধারণ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্য পরিকল্পিত পথে ব্যক্তিবর্গ গৌণ গোষ্ঠী গঠন করে।

৫. কাঠামোর ধরণ (Types of Structure)

সাংগঠনিক কাঠামোগত বিচারে প্রাথমিক গোষ্ঠী হল বিশেষভাবে সরল, এই ধরনের গোষ্ঠীতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়। সদস্যগণ গোষ্ঠীবদ্ধ হন এবং তারা গোষ্ঠী বন্ধ থাকেন। বিপরীত ক্রমে গৌণ গোষ্ঠী হল বিশেষভাবে বিধিশাসিত গোষ্ঠী। প্রতিটি গৌণ গোষ্ঠী কতকগুলি বিধিবদ্ধ ও নির্দিষ্ট নিয়মকানুনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানিকভাবে নির্দিষ্ট কোন কর্তৃপক্ষ গৌণ গোষ্ঠীর পরিচালনার দায়িত্বে থাকে।

৬. নিজেই শেষ বনাম শেষের মানে (Ends in itself versus Means to an End)

প্রাথমিক গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ব্যক্তি প্রাথমিক সম্পর্কে প্রবেশ করে কারণ, এই ধরনের সম্পর্ক ব্যক্তিগত অবদান, উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও কল্যাণে অবদান রাখে। অন্যদিকে গৌণগোষ্ঠী লক্ষ্যভিত্তিক। সদস্যপদ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যর জন্য তৈরি হয়।

৭. অবস্থান (Position)

প্রাথমিক গোষ্ঠীতে, একজন ব্যক্তির অবস্থান বা মর্যাদা তার জন্ম, বয়স অনুসারে নির্ধারিত হয়। কিন্তু গৌণ গোষ্ঠীতে, একজন ব্যক্তির অবস্থান তার ভূমিকা দ্বারা নির্ধারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ পিতার অবস্থান জন্মের উপর ভিত্তি করে হয়, সেখানে একটি ট্রেড ইউনিয়নে সভাপতির অবস্থান নির্ভর করে তিনি ইউনিয়নে কী ভূমিকা পালন করবেন তার উপর।

৪. ব্যক্তির বিকাশের মধ্যে পার্থক্য (Difference in Development of Personality)

প্রাথমিক গোষ্ঠী একজন ব্যক্তি ও তার ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটায়। অন্যদিকে, গৌণ গোষ্ঠী, একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিশেষ দিকের বিকাশ ঘটায়। তাই যেখানে প্রাথমিক গোষ্ঠীর মাধ্যমে দয়া, সহানুভূতি, ভালোবাসা, সহনশীলতা, পারস্পরিক সাহায্য, ত্যাগের মনোভাব ইত্যাদির মনোভাব গড়ে ওঠে, ঠিক তেমনই গৌণ গোষ্ঠী আত্মস্বার্থ ও আত্মপ্রকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।

৯. সম্পর্ক (Relationship)

প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে বর্তমান থাকে মুখোমুখি পরিচয় ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। এই সম্পর্ক হল প্রত্যক্ষ, অন্তরঙ্গ ও ব্যক্তিগত। প্রতিটি সদস্যের ব্যক্তিত্বের সাথে প্রাথমিক গোষ্ঠী সম্পর্কযুক্ত, পক্ষান্তরে, গৌণ গোষ্ঠীর অন্তর্গত সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক পৃথক প্রকৃতির। এই সম্পর্ক হল অনুষ্ঠানিক ও গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের উপর প্রাথমিক গোষ্ঠীর কোন ধরনের কোনরকম প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। তার কারণ হল এই ধরনের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে সাধারণত কোন মুখোমুখি ও প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকে না। তাছাড়া, এই সমস্ত সদস্যদের চিন্তাভাবনা ও মানসিকতায়ও সাদৃশ্য থাকে না। গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পরোক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ নির্দিষ্ট কাজ করে চলে ও নির্দেশ পালন করে থাকে। এর অর্থ হল, গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষর তাগিদে প্রত্যেক স্ব স্ব ভূমিকা স্বতন্ত্রভাবে সম্পাদন করে। উদাহরণ হিসাবে, যে কোন দেশের জাতীয় স্তরের একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল

এবং তার সদস্যদের কথা উল্লেখ করা যায়। গৌণ গোষ্ঠীগুলিত গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ও স্বার্থই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। বিপরীতক্রমে, প্রাথমিক গোষ্ঠীতে প্রাধান্য পায় গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক।

১০. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control)

প্রাথমিক গোষ্ঠীর নিয়োগ পদ্ধতিটি হল আনুষ্ঠানিক (formal) সুতরাং, আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরোও কার্যকরী হয়। যেহেতু প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে নৈকট্য ও অন্তরঙ্গতা খুব বেশি থাকে, তাই সদস্যদের উপর বিশেষ আকারে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। প্রতিবেশী ও পরিবারের ব্যক্তি বিশেষের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এত বেশি থাকে যে তারা মাঝে মাঝে সেই পরিবেশ থেকে চলে যেতে চায়। অন্যদিকে, গৌণ গোষ্ঠীগুলিতে লক্ষণের বিচ্যুতি নিরূপণের জন্য বিভিন্ন উপায় ব্যবহার করা হয়। এখানে সম্পর্কের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কাঠামো বিদ্যমান থাকায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরও সুসংহত ও কার্য্যকর হয়ে ওঠে।

৯.৬ নির্দেশক গোষ্ঠী (Reference Group/ Tertiary Group)

অনুকরণ করার প্রবণতা মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এই প্রবণতা মানব প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত হয়। সমজস্ব ব্যক্তি বর্গের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অনুকরণ করার ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। উন্নতির সোপান বেয়ে যখন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ক্রমে উপরে উঠতে থাকে, তখন অপরাপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীতে একই পথ ধরে যাত্রা করে উন্নতি লাভের উদ্দেশ্য আগ্রহী ও উদ্যোগী হয়ে থাকে। এই যে অপর গোষ্ঠীর রীতি-পদ্ধতি প্রভৃতি অনুকরণ তথা আয়ত্ত করার উদ্যোগ আয়োজন তার পিছনে থাকে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সম্মান প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা। অন্যানদের সঙ্গে তুলনা করে এই ধরনের যে আচরণ তাকে বলা হয়, 'নির্দেশক আচরণ'। নির্দেশক গোষ্ঠী ও নির্দেশক আচরণের কিছু বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

বিশেষ কোন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির ব্যাপারে অপর কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আদর্শরূপে গণ্য করে ও তাদের অনুসরণে আগ্রহী ও উদ্যোগী হয়।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে বিচার করে দেখে।

সমাজে যে স্তরবিন্যাস বর্তমান, তার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, নির্দেশক গোষ্ঠী ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করে। এই ধরনের ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর সাধারণ নিজের দুর্বলতা, ন্যূনতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সচেতনা থাকতে দেখা যায়।

৯.৭ সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়টি সামাজিক গোষ্ঠী ও তাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করে। সামাজিক গোষ্ঠী এমন একটি সমষ্টি যেখানে ব্যক্তি একে অপরের সাথে যোগাযোগ, সম্পর্ক এবং পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে একটি

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের চেষ্টা করে। প্রাথমিক গোষ্ঠী, যেমন পরিবার, বন্ধুবান্ধব, বা খেলার দল, ছোট এবং গভীর সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত হয়, যেখানে সদস্যরা পরস্পরের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে। অন্যদিকে, গৌণ গোষ্ঠী বৃহত্তর আকারের, যেখানে সদস্যদের মধ্যে সরাসরি সম্পর্কের অভাব থাকে, কিন্তু তারা একটি সাধারণ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধনে একত্রিত হয়। এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যগুলো সমাজে তাদের ভূমিকা এবং প্রভাবকে বিশেষভাবে নির্ধারণ করে।

৯.৮ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

১। সামাজিক গোষ্ঠী কী এবং এটি সমাজে কিভাবে গঠন হয়?

২। প্রাথমিক গোষ্ঠী এবং গৌণ গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য কী? উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুন।

৩। প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

৪। গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন হয়? তাদের উদ্দেশ্য কী হতে পারে?

৫। প্রাথমিক গোষ্ঠী সমাজে কিভাবে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে?

৬। সামাজিক গোষ্ঠীর গঠন ও সদস্যদের আচরণের মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে?

৭। সামাজিক গোষ্ঠী কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ভূমিকা কী?

৮। 'গৌণ গোষ্ঠী' এবং 'প্রাথমিক গোষ্ঠী' এর মধ্যে সম্পর্কের ধরণ কেমন এবং তা সমাজের কার্যক্রমে কীভাবে প্রভাব ফেলে?

৯। কীভাবে সামাজিক গোষ্ঠী আমাদের সমাজে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখে?

১০। আপনার মতামত অনুযায়ী, সামাজিক গোষ্ঠীর ভূমিকা মানব সমাজে কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে?

৯.৯ অভিসম্বন্ধ (Reference)

Agarwal, J. C (2002) Theory and Principles of Education (13th ed.) New Delhi; Vikash Publishing House.

Bhatia, K & Bhatia, B. D (1992) Theory and Principles of Education (20th Ed) Delhi; Doaba House.

Bhattacharya, D. C (1996). Sociology (6th ed.) Cacutta Vijoya Publishing House.

Pandey, R.S (2009) Principals of Education (13th Ed) Agra-2, Agrawal Publications.

Ravi, S. S (2015) A comprehensive sudy of Education (2nd Ed) Delhi; PHI Learning Sharma, Y. K. (2016) Foundation in Sociology of Education, Delhi;

Saxena, N.R.S (2009) Principles of Education Meerut; Vinay Rakhija

অধ্যায় ১০ ❑ সামাজিক পরিবর্তন : ধারণা, উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার ভূমিকা (Social Change: Concept, Scope and Role of Education)

গঠন

১০.১ উদ্দেশ্য

১০.২ ভূমিকা

১০.৩ সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

১০.৪ সামাজিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্য

১০.৫ সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষার ভূমিকা

১০.৬ সারসংক্ষেপ

১০.৭ স্বমূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

১০.৮ অভিসম্বন্ধ (Reference)

১০.১ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায় পড়ার পর ছাত্র-ছাত্রীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবগত হবেন-

- সামাজিক পরিবর্তন কি
- সামাজিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্য কি
- সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা কি?

১০.২ ভূমিকা

পরিবর্তন হল প্রকৃতির ধর্ম। প্রকৃতিতে এমন বিষয় হয়ত বা খুব কম আছে যা স্থিতিশীল, সময়ের সাথে যার কোন পরিবর্তন হয়না। পরিবর্তন একটি সামাজিক নিয়ম আর যে শুধু ভূত আর বর্তমান দেখে, তার নজরে ভবিষ্যত কোনদিন ধরা পড়ে না, সমাজ সর্বদাই গতিশীল মানুষ সবসময় সামনের দিকে তাকায় যাতে সে ভবিষ্যতে প্রকৃতির সাথে মানিয়ে নিতে পারে। তাই প্রকৃতির সাথে তার সংযোগ স্থাপিত হয়। আর যেখানেই সংযোগ স্থাপিত হয়। সেখানেই পরিবর্তন অব্যসম্ভাবী। কোন কোন সময় পরিবর্তনের মাত্রা থাকে ধীর, শুস্থ আর কোন কোন সময় তার গতি হয় তীব্র। প্রত্যেক গোষ্ঠী, সমাজ ধীরে ধীরে তার

রীতিনীতি, সংস্কৃতি মূল্যবোধ ইত্যাদি গড়ে তুলছে থাকে সেই সভ্যতার সংস্কৃতি বলে।

এ প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার ও পেজ বলেছেন, 'সমাজ হল জীবন প্রবাহের একটি কালক্রম। এই সমাজের ধারণা স্থিতিশীল নয়। গতিশীল সমাজ হল একটি বিশেষ প্রক্রিয়া, এ কোন ফলশ্রুতি নয়'

১০.৩ সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা (Concept of Social Change)

International Encyclopaedia of the Social Science (IEES 1972) তে বলা হয়েছে, 'looks at changes as the important alternations that occur in the social structure or in the pattern of action and interaction in societies'.

পরিবর্তন সংগঠিত হয় সামাজিক প্রচলিত রীতিনীতিতে, গোষ্ঠীর আকার আয়তনে, কোন নির্দিষ্ট সামাজিক প্রতিষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানগুলির অভ্যন্তরীণ সম্পর্কে। সামাজিক পরিবর্তনের অন্যান্য সংজ্ঞাগুলি ইঙ্গিত করে পরিবর্তন আসে সামাজিক ব্যবস্থায় ও সামাজিক কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান, তাদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া সামাজিক ক্রিয়াকার্ম, অবসর গ্রহণের প্রণালী, সামাজিক ভূমিকা ও সামাজিক অন্যান্য বিভিন্ন ধরণ ও ধরণতে আর এই সবই ঘটে সামাজিক পরিবর্তনের ফলাফল হিসাবে।

সামাজিক পরিবর্তন বলতে কোন গুণগত পরিবর্তন বোঝায় না। সমাজের পরিবর্তন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যাকে "Socio-Cultural Change" (সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন) বলে অভিহিত করা হয়। কিছু সমাজ বিজ্ঞানী অবশ্য সামাজিক পরিবর্তন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে। সামাজিক পরিবর্তনকে সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন বলে সংজ্ঞায়িত করে। তারা সমাজের আকার আয়তনের মধ্যে পরিবর্তন, সামজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন হিসাবে ব্যাখা করে। তারা মনে করে সামাজিক পরিবর্তন বলতে বোঝায় প্রধানত প্রকৃত মানুষের আচরণের মধ্যে পরিবর্তন। অন্যদিকে সংস্কৃতিক পরিবর্তন বলতে সাংস্কৃতিক ঘটনা যেমন— জ্ঞান, ধারণা, শিল্প, ধর্ম, নৈতিক মতবাদ, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ইত্যাদির মধ্যে ভিন্নতাকে বোঝায়। তবে এই পার্থক্য বিমূর্ত। কারণ কেন পরিস্থিতিতে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে, তা নির্ণয় করা কঠিন বা প্রায় অসম্ভব। এই ক্ষেত্রে, বর্তমান সমাজ কাঠামোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে, আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ যা অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক পরিবর্তন তার গতিতে ও পরিধিতে পরিবর্তিত হতে পারে। আমরা ছোট ক্ষেত্রে বা বড় ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তন বলতে পারি। বৃত্তকারেও সামাজিক পরিবর্তন সংগঠিত হয়। কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিতে প্রশাসনিক স্তরে সমাজিক পরিবর্তন সংগঠিত হয়। এটা কখনও কখনও বিপ্লবীও হতে পারে। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার উৎখাত হলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা যায়। জাতি গোষ্ঠীর পরিবর্তনের মধ্যে স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তন দেখা যায় (Migration Rate / পরিযায়ী পরিমানের ওপর), পাশাপাশি অর্থনৈতিক কাঠামতো দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন দেখা যায়। পরিবর্তন কখনও অবিরাম প্রক্রিয়া

বিশেষত, কিন্তু কখনও কখনও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ারূপেও আত্মপ্রকাশ করে, বিশেষত কোন নির্দিষ্ট প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বা সামাজিক কিছু উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যা একক সময়ে আবির্ভূত হয়ে প্রচলিত সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়।

১০.৪ সামাজিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্য (Objective of Social Change)

সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ক্রমাগত ও ধীর প্রক্রিয়া। সমাজ পরিবর্তনের সামাজিক প্রয়োজনও আছে। সমাজ সামাজিক পরিবর্তন ঠেকতে পারে না। সমাজ পরিবর্তন সমাজের অপরিহার্য অংশ যা সমাজের সম্পূর্ণ কাঠামো বা কোন অংশের সাথে যুক্ত হতে পারে। সামাজিক পরিবর্তনের গতি সমাজে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয় বিভিন্ন হারে। এক সামাজিক গোষ্ঠীর পরিবর্তন অন্য সামাজিক গোষ্ঠীর পরিবর্তনকে উৎসাহিত করে। পরিবর্তন একটি সামাজিক বিচ্যুতিও, যখন প্রয়োজনের থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত অংশ বেশী বাদ দেওয়া হয়। সামাজিক পরিবর্তন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনের সাথেই জড়িত নয়। ব্যক্তিবিশেষের সামাজিক পরিবর্তনের সাথেও জড়িত। নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও বুদ্ধিমত্তার সাহায্যেও সামাজিক পরিবর্তন ঘটানো যায়। প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষের জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে এবং তারা তা অর্জন করার চেষ্টা করে। সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য ও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে সে উদ্যেগী হয়। সুতরাং প্রতিটি সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কাজ করে। যখন ব্যক্তিরা নিজেদের অবস্থার বা ভূমিকা পরিবর্তন নিয়ে উদ্বিগ্ন ও উদ্যেগী হয়, তখন তাদের চিন্তা ও ব্যবহার সমাজের মধ্যে সমাজের মধ্যে স্থিতিশীলতার অভাব তৈরি করে, এর ফলে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন- প্রযুক্তি, শিল্পায়ন, ধর্ম ও আদর্শে, যেকোন কারণে পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়। পরিবর্তন শুরু হয় উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। উদ্ভাবনের বিভিন্ন ধরন, তার সঙ্গে সম্পর্কিত সামাজিক নিয়ম-কানুন, প্রথা, ঐতিহ্য, চরিত্র এবং মানুষের আচরণ মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন ঘটে এবং তা ত্বরান্বিত হয়। কিন্তু, আমরা কখনই বলতে পারি না যে, কজনের চেয়ে অন্যজনের অবদান বেশি, সামাজিক পরিবর্তন অনার ক্ষেত্রে। এটাও কখন বলা বা অনুমান করা সম্ভব নয় যে, ভবিষ্যতে সমাজে কি পরিবর্তন অসতে চলেছে। পরিবর্তন প্রকৃতির নিয়ম ও সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে অপরিহার্য। সামজিক পরিবর্তন মানে কিছু পুরনো জিনিস বা উপাদানকে বর্জন করা এবং নতুন জিনিস যোগ করা। সামাজিক পরিবর্তন সাধারণত ধরা হয়, সমাজের ভালোর জন্যই সংগঠিত হয় বা কখনও কখনও অন্যথাও হয়। আমাদের ঐতিহ্যের মধ্যে কখনও কখনও পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু এটা বলা দুঃসাধ্য, সেটই সামাজিক পরিবর্তন কিনা।

১০.৫ সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষার ভূমিকা (Role of Education in Social Change)

শিক্ষা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছে। শিক্ষা ব্যক্তিকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলে। ব্যক্তি বিশেষদের সমষ্টির পরিবর্তন থেকে সামাজিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন আসে। বিজ্ঞানের উন্নতির প্রধান উপকরণ হল শিক্ষা, এবং প্রযুক্তির বিকাশ হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি যা সমাজে ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে সমাজের অভ্যন্তরীণ কাঠামোয় পরিবর্তন আনতে পারে। ফ্রান্সিস জে. ব্রাউন মন্তব্য করছেন, শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যা সমাজের আচরণে পরিবর্তন আনে (Education is a process which brings about changes in the behaviour of our society)। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা প্রতিটি ব্যক্তিকে কার্যকরভাবে সক্ষম করে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করতে ও সমাজের অগ্রগতিতে ইতিবাচক অবদান রাখতে।

শিক্ষা সামাজিকীকরণের প্রধান উপাদান হিসাবে গৃহীত এবং শিক্ষক সেই সামাজিকীকরণের মাধ্যমে হিসাবে কাজ করে। শিক্ষাকে একটি যন্ত্র হিসাবে বর্ণনা করে, তিনটি মাধ্যমের সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকাকে তুলে ধরা হয়—

i) পরিবর্তনের মাধ্যম

ii) পরিবর্তনের বিষয়বস্তু

iii) যাদেরকে পরিবর্তন করতে চাওয়া হয় তাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট অর্থাৎ ছাত্র।

শিক্ষামূলক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি সেই গোষ্ঠীর মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে যার দ্বারা শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই হিসাবে শিক্ষকরা সুনির্দিষ্ট করেছেন শিক্ষা উপযোগী মূল্যবোধ ও আকাঙ্খা শিশুদের জন্য। শিক্ষিত সমাজ সংস্কার করা মূল্যবোধের উপর জোর দিয়েছিলেন, যেমন জাতপাতের উপর বিধিনিষেধ অপসারণ, সামাজিক ক্ষেত্রে নারীদের সমতা, সামাজিক কুফল দুরীকরণ, দেশের শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক কণ্ঠস্বরের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। তাই, তারা এইভাবে উদারনৈতিক দার্শনিক শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। অন্যকথায়, শিক্ষাকে জ্ঞানের আলো বলে বিবেচনা করা হয় যা অশিক্ষার অন্ধকারকে দূর করে। একটি স্থির অগতিশীল সমাজে, শিক্ষার মূল ঐতিহ্য হল সেই সমাজের সাংস্কৃতির ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে সঞ্চারিত করা। কিন্তু পরিবর্তনশীল সমাজে, সংস্কৃতি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পরিবর্তনশীল, শিক্ষা এইসব সমাজের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বহন করবে না, সাহায্য করবে সংস্কৃতির মধ্যে যে ধরনের পরিবর্তন হয়েছে বা হতে পারে, তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভবিষ্যত সমাজের জন্য তরুণদের প্রস্তুত করা। সাম্প্রতিক সমাজে, 'The proportion of change that is either planned or issues from the secondary conequences of deliberate

innovations is much higher than in former times'. নতুন গঠিত হওয়া সমাজের ক্ষেত্রে এটি বেশি মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়, যারা এখনও উন্নয়ণশীল অবস্থায় আছে। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজ পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ, কখনও কখনও শিক্ষা সমাজকে প্রভাবিত করে আবার কখনও কখনও সমাজ শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে।

১০.৬ সারসংক্ষেপ

প্রকৃতির নিয়মই হল পরিবর্তন। স্বভাবতই সৃষ্টির সর্বত্র পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, সমাজ ও এই নিয়মের বাইরে নয় সমাজব্যবস্থা একটি পরিবর্তনশীল ব্যবস্থা। ম্যাকাইভার ও পেজ বলেছেন, 'Social change refers to a process responsive to many types of changes to changes in the manmade conditions of life to changes in the attitudes and beliefs of men and to the changes that go beyond the human biological and physical nature of things'.

১০.৭ স্বমূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

১. সামাজিক পরিবর্তন কি?

২. সামাজিক পরিবর্তনের কারণগুলি কি কি?

৩. সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষার ভূমিকা কি?

৪. সামাজিক পরিবর্তন ধীর প্রক্রিয়া এবিষয়ে আপনার মতামত লিখুন।

১০.৮ অভিসম্বন্ধ (Reference)

Agarwal, J. C (2002) Theory and Principles of Education (13th ed.) New Delhi; Vikash Publishing House.

Bhatia, K & Bhatia, B. D (1992) Theory and Principles of Education (20th Ed) Delhi; Doaba House.

Bhattacharya, D. C (1996). Sociology (6th ed.) Cacutta Vijoya Publishing House.

Pandey, R.S (2009) Principals of Education (13th Ed) Agra-2, Agrawal Publications.

Ravi, S. S (2015) A comprehensive sudy of Education (2nd Ed) Delhi; PHI Learning Sharma, Y. K. (2016) Foundation in Sociology of Education, Delhi;

Saxena, N.R.S (2009) Principles of Education Meerut; Vinay Rakhija

অধ্যায় ১১ ❑ ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার সামাজিক পরিবর্তন (Social Change in India; Sanskritization, Westernization, Modernization and Globalization)

গঠন

১১.১ উদ্দেশ্য
১১.২ ভূমিকা
১১.৩ ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক পরিবর্তন
১১.৪ সংস্কৃতায়ন
১১.৫ পশ্চিমীচরণ
১১.৬ মানবতাবাদের প্রবর্তন (Humanitarianism)
১১.৭ বিশ্বায়ন
১১.৪ সারসংক্ষেপ
১১.৯ স্বমূল্যায়ন প্রশ্নাবলী
১১.১০ অভিসম্বন্ধ (Reference)

১১.১ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায় পড়ার পর ছাত্র-ছাত্রীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবগত হবেন—

- ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় কিভাবে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল?
- সংস্কৃতায়ন কি ও ভারতীয় সমাজে তার প্রভাব কি?
- পশ্চিমীকরণ কি ও ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় তার প্রভাব কি?
- বিশ্বায়ন কি ও ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় তার প্রভাব

১১.২ ভূমিকা

'সংস্কৃতিকরণ বা সংস্কৃতায়ন' পশ্চিমীকরণ এবং বিশ্বায়ন হল তিনটি প্রক্রিয়া, এই তিনটি প্রক্রিয়ার দ্বারাই ভারতীয় সমাজে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এই সামাজিক পরিবর্তন

ও সামাজিক সচলতা সাধিত হয়। ভারতীয় সমাজ জাতপাতের কাঠামোর কঠিন আবদ্ধের মধ্যেও এই সচলতা পরিলক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের মত উঁচু জাতের জীবন ধারা অনুসরণ করে, নিচু জাতের লোকজনরা উচ্চজাতে আসীন হওয়ার চেষ্টায় ব্রতী হয়, একেই শ্রীনিবাস 'সংস্কৃতায়ন' বলেছে একইরকম ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক সমাজকে ভূমিকা পালন করেছে।

১১.৩ ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক পরিবর্তন

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক পরিবর্তন একটি দীর্ঘ এবং জটিল প্রক্রিয়া, যা প্রথাগত ও আধুনিকতার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে। ভারতীয় সমাজ এক সময় কট্টর জাতিভেদ, ধর্মীয় বিভেদ এবং শ্রেণীবৈষম্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হত। তবে গত শতাব্দীতে, বিশেষ করে স্বাধীনতার পর থেকে, এই সমাজ কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। ব্রিটিশ শাসন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, এবং পরবর্তীতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, গণতন্ত্র এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ফলে ভারতীয় সমাজে নতুন ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে। গ্রামীণ সমাজের ঐতিহ্যবাহী শ্রেণীবিভাগ, যেমন জাতি এবং বর্ণের ভিত্তিতে বিভক্ত সমাজ, ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। নারী শিক্ষা এবং অধিকার বৃদ্ধির ফলে নারী সমাজের অবস্থানেও পরিবর্তন এসেছে। মহিলারা এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং রাজনীতিতে, পুরুষদের সাথে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছে।

শহুরে জীবনের প্রসার এবং প্রযুক্তির বিকাশও সামাজিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর ফলে নতুন ধারণা, জীবনধারা এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ভারতীয় সমাজে জায়গা পেয়েছে। তথাপি, এই পরিবর্তনগুলো সব ক্ষেত্রেই সমানভাবে ঘটেনি। গ্রামাঞ্চলে এখনও অনেক পুরনো প্রথা এবং সামাজিক অবিচার রয়ে গেছে। তবে, ভারতীয় সমাজের ক্রমবর্ধমান সচেতনতা, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে, সমাজে বৈষম্য দূরীকরণ এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে চলেছে। এই পরিবর্তন ভারতীয় সমাজের ন্যায়, সাম্য এবং মানবাধিকার ভিত্তিক এক নতুন দিগন্তের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

১১.৪ সংস্কৃতায়ণ (Sanskritization)

ভারতীয় সামাজিক প্রেক্ষাপটেই সংস্কৃতায়ণের অস্তিত্বের হদিশ পাওয়া যায়। 'সংস্কৃতায়ণ' শব্দটি প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী M. N. Srinivas এর সৃষ্টি। তিনি 'Religion and Society, among the Coorgs of Southern India' শীর্ষক বইতে ১৯৫২ সালে শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। শ্রীনিবাস সাধারণভাবে সামাজিক গতিশীলতার এবং বিশেষত নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যেকার সামাজিক গতিশীলতা ব্যাখার ব্যাপারে সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়াটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি অন্তবর্ণ গতিশীলতার প্রক্রিয়া হিসাবে সামাজিকীকরণকে চিহ্নিত করেন। Social Change in Modern India নামক গ্রন্থে শ্রীনিবাস লিখেছেন ভারতীয় সমাজে সংস্কৃতায়ণ হল সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। শ্রীনিবাসের অভিমত অনুসারে উচ্চবর্ণের জাতির জীবনযাত্রার প্রণালী অনুকরণ করার ব্যাপারে নিম্নবর্ণের জাতির মধ্যে

একটি স্বাভাবিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই প্রবণতাকে নিম্নবর্ণের জাতি সযত্নে পালন করে। তারা উচ্চবর্ণের শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান, জীবনরীতির বিধি নিষেধ, জীবনযাত্রা, প্রণালী প্রভৃতি অনুসরণ করে চলে। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দীর্ঘকাল ধরে এইরকম অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে উচ্চবর্ণে উন্নীত হওয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট হয়। তারা তাদের পদবীর পরিবর্তন ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজকর্ম সম্পাদন করতে থাকে। তারপর তারা কালক্রমে নিজেদের সংশ্লিষ্ট উচুঁ জাতির অন্তভুক্ত বলে দাবি করতে থাকে। এবং এই দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য তারা সর্বতোভাবে উদ্যেগী হয় ও প্রচার চালায়।

সংস্কৃতিকরণ হল একটি বিশেষ প্রক্রিয়া যার দ্বারা নীচু জাতির হিন্দু বা আদিবাসী বা অন্যান্য জনগোষ্ঠী নিজেদের প্রথা, রীতিবিধি, আদর্শবোধ এবং জীবনযাত্রার প্রণালী পরিবর্তন করে উচুঁজাতের এবং সাধারণত দ্বিজবর্ণের সমাজ হওয়ার চেষ্টা চালায়। "Sanskritization is the process by which a 'Low Hindu cast, or tribal or other group, changes its customs, ritual, ideology and way of life in the direction of a high and frequently, twice born castle".

বর্ণের শাস্ত্রীয় বর্ণনা সংস্কৃত বৈদিক যুগ থেকে হয়ে এসেছে (১২০০-১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) এবং রঙ এর উপর নির্ভর করে বর্ণের ধারণা মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেখানে চার অনুমিত আচার অনুষ্ঠানের বিশুদ্ধতার ক্রমানুসারে বর্ণপ্রথা গড়ে উঠেছে।

১) ব্রাহ্মণ (পুরোহিত ও পণ্ডিত)

২) ক্ষত্রিয় (শাসক ও যোদ্ধা)

৩) বৈশ্য (বণিক ও ব্যবসায়ী) এরা প্রতিনিধিত্ব করে 'দুইবার জন্ম নেওয়া' উচ্চবর্ণ ও যাদের পুরুষ সদস্যরা অনুষ্ঠানিক উপাচারের মাধ্যমে পবিত্র সুতো দান করে 'দ্বিতীয়' জন্মের অধিকারী হয়েছে।

৪) শূদ্র (শ্রমিক ও চাকর) এবং দলিত (অস্পৃশ্য বা হরিজন), যাদের মধ্যে পরেরটিকে পরবর্তীকালে প্রযুক্তিগতভাবে বর্ণভেদ প্রথার বাইরে রাখা হয়।

যদি ভারতীয় সমাজে বর্তমানকালের দলিতদের আন্দোলনগুলি দেখি, তাহলে বোঝা যাবে শুধুমাত্র সংস্কৃতিয়ানের জন্য সামাজিক পরিবর্তন ঘটছে না। বরঞ্চ, শূদ্র ও দলিতরা সমাজের উচ্চ সিড়িতে উঠতে সক্ষম হচ্ছে। তার মূলে আছে শিক্ষা, সম অধিকার, ইংরাজী শেখার সুযোগ, ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিষ্কার পানীয়, চাকরি ইত্যাদি।

সংস্কৃতকরণের মডেল (Models of Sanskritization)

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গোষ্ঠীর জাতিগুলিকে উচ্চ বা নিম্ন মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। পবিত্র সুতো পরা, মাংস ও মদের ব্যবহার থেকে বিরত থাকা, বিধবা বিবাহ না করা, অন্তঃবিবাহকে প্রাধান্য দেওয়া ধর্মীয় পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে পূজো করা ধর্মীয় গ্রন্থ ও পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি ঝোঁক ও শ্রদ্ধা

ভিক্ষা প্রদান এবং পূজার সময় উপঢৌকন, বৃদ্ধির ব্যবহার, প্রদীপ, ফুল শস্য ও বিসর্জন, ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিতে মন্দির ও তীর্থস্থানগুলিকে পবিত্রতা দেওয়া হয়েছে। তারা পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতার পরিমাপের মান হিসাবে বিবেচিত। সুতরাং দত্তক গ্রহণ, একজনের জীবনধারার উচ্চবর্ণের পথ এবং বর্ণ, আশ্রমের আদেশ গ্রহণ, কর্ম ও পুনর্জন্ম ইত্যাদি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রদত্ত চিন্তার প্রতি বিশ্বাস প্রদর্শন, ধর্ম, গুণ, মোক্ষ, মায়া ও ব্রহ্মা ইত্যাদি সবই সংস্কৃতকরণের বিশেষ রূপ। সংক্ষেপে ধর্মে বর্ণিত বিশুদ্ধতার আচরণ ও নিয়ম মেনে নেওয়া গ্রন্থগুলির সংস্কৃতকরণের একটি রূপ।

বর্ণ মডেল (Varna Model)

ভারতের প্রাচীন বর্ণ ব্যবস্থা চারটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণরা ধর্মীয় আচার ও জ্ঞানচর্চার দায়িত্ব পালন করত, ক্ষত্রিয়রা শাসন ও সামরিক শক্তির অধিকারী ছিল, বৈশ্যরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজে নিযুক্ত থাকত, এবং শূদ্ররা মূলত শ্রমজীবী শ্রেণি হিসেবে সমাজে কাজ করত। এদের বাইরেও ছিল অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য সম্প্রদায়, যাদের সামাজিকভাবে সবচেয়ে নিচু স্তরে গণ্য করা হতো।

সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষরা মর্যাদা ও ক্ষমতা ভোগ করত, যেখানে নিম্নবর্গীয়রা তাদের জীবনধারা, রীতি-নীতি ও সংস্কৃতি অনুসরণ করত। সংস্কৃতায়ণ (Sanskritization) বলতে বোঝায় নিম্নবর্ণের মানুষদের উচ্চবর্ণের আচার-আচরণ, পোষাক, ভাষা ও জীবনযাত্রা অনুকরণের প্রক্রিয়া, যা সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতো। সমাজতাত্ত্বিক এম. এন. শ্রীনিবাস প্রথম এই ধারণা উপস্থাপন করেন।

সংস্কৃতায়ণের ফলে সামাজিক গতিশীলতা (Social Mobility) তৈরি হয়, যা নিম্নবর্ণের মানুষদের উচ্চবর্ণের মতো জীবনধারা গ্রহণের সুযোগ দেয়। তবে এটি বর্ণ বৈষম্য দূর করতে পুরোপুরি সক্ষম হয়নি, বরং বহুক্ষেত্রে বিদ্যমান সামাজিক অসাম্যকে দীর্ঘস্থায়ী করেছে।

স্থানীয় মডেল (Local Model)

প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে, কিছু বর্ণ তাদের সংখ্যাগত বা অর্থনৈতিক শক্তির ভিত্তিতে অন্যদের চেয়ে বেশি সম্মানিত বলে বিবেচিত হয়। এই জাতিকে "Master Class" বলা হয় অথবা শ্রীনিবাসের কথায় বলা যেতে পারে, "The Dominant Class"। নিম্নবর্ণের লোকেরা এই প্রভাবশালী বর্ণের জীবনধারা অনুকরণ করে ও তাদের আধিপত্য বাড়ানোর চেষ্টা করে। স্থানীয় উচ্চবর্ণের জাতিগুলি নিম্নবর্গীয়দের কাছে অনুপ্রেরণার কাজ করে। সংস্কৃতকরণের মডেলগুলি প্রভাবশালীদের মত অনুযায়ী পরিবর্তন হতে থাকে। এবং সংস্কৃতকরণের ক্ষেত্রে আধিপত্যশীল জাতিগুলি প্রক্রিয়াটিকে অগ্রসর বা পিছিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি বর্ণের প্রভাবশালী হওয়ার জন্য, একটি বিশাল পরিমাণ আবাদযোগ্য জমি থাকা উচিত, গোষ্ঠীতে তাদের সংখ্যার প্রাধান্য থাকা উচিত এবং স্থানীয় শ্রেণীবিন্যাসে

সেই বর্ণ যদি উচ্চস্থান দখল করে থাকে, তাহলে সেই বর্ণ স্থানীয় সংস্কৃতায়ণকে প্রভাবিত করবে। আধিপত্যের নতুন কারণগুলির মধ্যে আছে পশ্চিমীশিক্ষা, প্রশাসনে চাকরি এবং শহুরে আয়ের উৎস। এই প্রভাবশালী জাতিগুলি নিম্নবর্ণের মধ্যে অনুকরণ করার ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলে, তারা সেই মর্যাদাপূর্ণ জীবনধারা পাবার লক্ষ্যে তারা তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হয়। কিছু কিছু জায়গায় এমন অভিযোগও শোনা যায়। উচ্চবর্গীয়রা নিম্নবর্গীয়দের উপর অত্যাচার করে ও তাদের পদে পদে ছোট দেখায় এবং তাদেরকে বাধ্য করে যাতে তারা তাদের জীবনশৈলী অনুকরণ না করে।

সংস্কৃতকরণের জন্য প্রেরণা (Motivation for Sanskritizaion)

সংস্কৃতকরণের পিছনে যে কারণটি অন্যদের উৎসাহিত করে তা হল সংস্কৃতকরণের ফলে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সদস্য একই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করে যা উচ্চ বর্ণের লোকেরা উপভোগ করত। নিজের মান বাড়ানোর এই অনুপ্রেরণা আসত আপেক্ষিক বঞ্চনার অনুভূতি থেকে কারণ হিন্দু সমাজ বর্ণাশ্রম প্রথা দ্বারা কাটোর ভাবে চালিত হত। জীবনের সম্ভাবনা, সামাজিক সুযোগ, অর্থনৈতিক অবস্থান ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সবকিছুই বর্ণপ্রথা দ্বারা নির্ধারিত হতো। অনমনীয় বর্ণের নিয়মগুলি বর্ণের মধ্যে বিস্তর দূরত্ব তৈরি করেছিল। সব ধরনের সামাজিক সুযোগ সুবিধা উচ্চবর্ণের লোকেরা ভোগ করত, যেখানে নিম্নবর্ণের লোকেরা এইসব সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। সুতরাং সংস্কৃতাকরণের মাধ্যমে একজনের সামাজিক অবস্থান বাড়ানোর সর্বোত্তম উপায় হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। সংস্কৃতকরণের পিছনে আর একটি অন্তঃনিহিত কারণ ছিল চাপা আন্তঃশ্রেণী বৈরিতার প্রকাশ। যে বর্ণাশ্রম প্রথার জন্য তারা উচ্চবর্গে বিরাজ করত, সুবিধা ভোগ করত তাদের উপরই হতাশা ও বিরক্তি ফুটে উঠত।

১১.৪.১ সংস্কৃতকরণকে গতিশীল করার কারণগুলি (Factgors Facilitating Sanskritization)

সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়াকে গতিশীল করার কারণগুলিকে আধুনিক ভারতীয় প্রেক্ষাপটে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলি হল

১. **ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা (British Rule):** ভারতে ব্রিট্রিশ শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে নিম্নবর্ণের মানুষ সংস্কৃতকরণের মাধ্যমে নিজেদের মর্যাদা বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল। যেহেতু ব্রিটিশরা বর্ণপ্রথা নিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিল না তাই তারা সংস্কৃতকরণের গতিশীলতার সাথে ন্যূনতম ভাবেও জড়িত ছিল না।

২. **যোগাযোগের উন্নয়ণ (Development of Communication):** সড়ক ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ণ পূর্বের দুর্গম এলাকাগুলোর সংস্কৃতকরণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। রেল ও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মানুষ ধর্মীয় কেন্দ্র যেমন মথুরা, দ্বারকা, গয়া, কাশী, পুরী ইত্যাদি জায়গায় ভ্রমণ করতে সক্ষম হয়েছে।

৩. **যোগাযোগের পন্থা হিসাবে গণমাধ্যমের বিকাশ (Development of the Man Media of Communication):** রেডিও, সিনেমা, মাইক্রোফোন, সংবাদপত্র, ধর্মীয় পাক্ষিক পত্রিকা ইত্যাদি সংস্কৃতকরণকে প্রভাবিত করেছে ও সংস্কৃত মূল্যবোধ এবং মর্তাদশকে জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

৪. **রাজনৈতিক কারণ (Political Factors):** ভারত একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ। আর এটাই সংস্কৃতকরণের পথকে আরোও প্রশস্ত করেছে। সংস্কৃত কৃষ্টিতে যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিল তাকে ভারতীয় সংবিধান স্বমূলে উৎপাটিত করেছে। সর্বক্ষেত্রে সম অধিকার আইনের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। এবং অস্পৃশ্যতার অবসান হয়েছে। যার ফলে বর্ণাশ্রমের একচেটিয়া আধিপত্ব অনেকাংশে খণ্ডিত হয়েছে।

৫. **শিক্ষাগত কারণ (Educational Factor):** পশ্চিমী শিক্ষার প্রভাবের ফলে, সামাজিক ধর্মীয় আন্দোলন যেমন আর্যসমাজ, ব্রাত্ম সমাজ ইত্যাদি আন্দোলন সমাজের বুকে গড়ে ওঠে, যা সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়াতে অনেক অবদান রেখেছিল। এছাড়া নিম্নবর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে সাক্ষরতা, সংস্কৃতকরণকে সম্ভব করে তোলে।

৬. **সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (Cultural Institution):** প্রতিটি মন্দির এবং তীর্থক্ষেত্র সংস্কৃতকরণের উৎস হিসাবে কাজ করেছে। উৎসব ও অন্যান্য বিবিধ অনুষ্ঠানে যেখানে তীর্থযাত্রীরা জড়ো হয়, তারা তাদের সাংস্কৃতিক ধারণা ও বিশ্বাস পরস্পরের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। আরও বেশি কিছু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আছে যার সাথে সন্ন্যাসী ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুসারীরা ওতপ্রতোভাবেই জড়িত, তারাও হিন্দুধর্মের ধারণা ও বিশ্বাসকে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

৭. **অর্থনৈতিক কারণ (Economic Factor):** উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা স্থানীয় বর্ণবিন্যাসে কোন ব্যক্তিবিশেষকে উচ্চবর্গে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। কিন্তু সম্পদ অর্জন, সংস্কৃতকরণের অন্যতম শর্ত তা সব সময় নয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীনিবাস একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। মহীশূরের একজাতি অপরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থান থাকা সত্ত্বেও নিজেদের সংস্কৃতকরণের মাধ্যমে উচ্চবর্গে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। তবে বাস্তবতা হলো যে অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হলে সংস্কৃতায়ণ সহজ হয়ে যায়।

৪. **সাম্প্রদায়িক আন্দোলন (Sectrian Movements):** সাম্প্রদায়িক আন্দোলনগুলিও সংস্কৃতকরণের পথকে সুপ্রশস্ত করেছিল। যখন তারা নিম্নবর্ণের সদস্যদের আকৃষ্ট করেছিল, তারা তাদের মর্যাদা বাড়াতে সাহায্যে করেছিল সাধকের দ্বারা পরিচালিত ভক্তি আন্দোলন ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে তাতে সামিল করেছিল। এটি সংস্কৃতকরণের শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল। এর ফলে সামাজিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়েছিল।

১১.৪.২ সামাজিক পরিবর্তনে সংস্কৃতকরণের প্রভাব (Effects of Sankritization on Social Change)

যদি ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বিজ জন্মানো বর্ণের দ্বারা প্রচলিত সাংস্কৃতিক আদর্শের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে (ব্রাক্ষ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য), তাহলে আমরা বলতে পারি, সংস্কৃতকরণের প্রক্রিয়া হাজার বছর ধরে গতিশীল ছিল, কারণ বিদেশি হানাদাররা তাদের নিজেস্ব সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে দ্বিজদ্বারা প্রচলিত সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছে। গ্রীস থেকে আগত সিকান্দার দ্য গ্রেটের উত্তরসূরি ছিলেন শুক, হূর্ণ এরা ভারতীয় রাজাদের পরাভূত করলেও এদের বর্ণ বা শ্রেণীকে নিম্নবর্গীয় ধরা হত, পরবর্তীকালে এরা ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করেন। মুসলিম, ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ শাসন করার জন্য, রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে থাকার জন্য, তাদের সংস্কৃতি পরিবর্তন করার দরকার পড়েনি।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে সংস্কৃতকরণ (Sanskritization in Religious Field)

নিম্নবর্গীয় মানুষরাও দ্বিজদের মতো মন্দির তৈরি করেছে। সেখানে দেব-দেবীর পাশাপাশি নিজ বর্ণের মহান ব্যক্তিদের বসিয়েছে। তারা অনেকে পবিত্র সুতোও ধারণ করেছে। তারা প্রতিদিন মন্দিরে যায়, আরতি ভজন করে। তারা নিজেদের বর্ণ থেকে পুরোহিত নির্বাচিত করেছে। মধ্যবর্ণায়দের মন্দিরে পুরোহিত হিসাবে দ্বিজদের নির্বাচন করা হয়। তারা দ্বিজদের মতো বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান করে। বলিদান ও হোম বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যাবলী শিশুদের নামকরণ উৎসবে করা হয়। তারা ক্রমশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে এগোচ্ছে। তিনি নিষিদ্ধ খাবার ও পানীয় গ্রহণ পরিত্যাগ করেছে। তারা অপবিত্র পেশাও পছন্দ করে না। তারা বাসনপত্র ও জামাকাপড় পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে যত্নবান। উপজাতি সম্প্রদায়ের হিন্দু ধর্ম গ্রহণও সংস্কৃতকরণের উদাহরণ। মধ্য বর্ণীয়রা বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দপ্তরের বিভিন্ন কার্যকর্মে নিযুক্ত থাকে। তারা ও ক্রমে ব্রাক্ষ্মণদের মত যাগযজ্ঞ করতে পারদর্শী হয়ে উঠেছে।

সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কৃতকরণ (Sankritization in Social Field)

সামাজিক পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সংস্কৃতকরণের সামাজিক দিকটি গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃতকরণ ধর্মীয় ব্যবস্থার সাথে প্রবলভাবে সম্পর্কিত হলেও এর প্রধান লক্ষ্য হল সামাজিক সংস্কৃতকরণ। নিম্নবর্ণের লোকেরা সংস্কৃতিকরণের প্রতি আগ্রহী কারণ এর ফলে তারা নিজেদের সামাজিক মর‍্যাদাকে উন্নতর করতে পারে ও বর্ণ শ্রেণীবিন্যাসে উচ্চস্তরে অবস্থান করতে পারে। তারা ব্রাক্ষ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের সমান জায়গা চায়। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা দ্বিজদের মত সমান জায়গা অর্জন করেছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কৃতিকরণ (Sanskritization in Economic Field)

পেশার পরিবর্তনেও সংস্কৃতকরণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সমাজ স্বীকৃত পেশা বা জীবিকা সামাজিক উচ্চতার প্রতীক। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে সব্জী ও ফেরিওয়ালার কাজ করে চলেছে ভাঙ্গীরা। অনগ্রসর শ্রেণী

উচ্চপদে কর্মরত। তফসিলি জাতি উপজাতিরা পরিষেবাগুলিতে সংরক্ষণের সুযোগ পায়। আবার দ্বিজরা বর্তমান সমাজে অনেক ক্ষেত্রে কেরানি বা পিয়ন হিসাবে তফসিলিজাতির কর্মকর্তাদের অধীনে কাজ করে।

জীবনযাত্রায় সংস্কৃতায়ণ (Sanskritization in Living)

জীবনযাপনের শর্তগুলিতে সংস্কৃতকরণ করা হয়েছে। অনেক নিম্নবর্ণের লোকের এখন পাকা বাড়িতে বসবাস করে। দ্বিজদের মতো নিম্নবর্ণের লোকেরা বসার ঘর ব্যবহার করছে। তারা 'চেয়ারের' দিকে আকৃষ্ট। ভয়ের কোনরকম অনুভূতি ছাড়াই তারা উচ্চবর্ণের সাথে খাটের উপর বসে। তারা তাদের বাড়ি ঘর পরিষ্কার রাখে। তারা দেওয়ালে হিন্দু দেবদেবী ও তাদের নেতাদের ছবি লাগায়। তারা নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পড়ে। পূর্বে তারা দ্রারিদ্যতার কারণে অর্ধ উলঙ্গ ছিল বা থাকতে বাধ্য হয়েছিল। এখন তারা উচ্চবর্ণের অনুরুপ পোশাক পড়ে ও একই ভাষায় কথা বলে।

সংস্কৃতকরণের অন্যান্য প্রভাব (Other Effects of Sanskritization)

অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও, সংস্কৃতকরণ নিম্নবর্গীয় মহিলাদের জীবনে বিভিন্ন অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। সংস্কৃতকরণের পূর্বে, তারা যেসব সামাজিক নিয়মাবলী পালন করত তা এত কঠোর ছিল না। কিন্তু সংস্কৃতকরণের ফলে যখন তারা উচ্চবর্ণের আচরণবিধি অনুকরণ করার চেষ্টা শুরু করল, তারা ব্রাক্ষ্মণ সমাজের বিভিন্ন রীতিনীতি অনুসরণ শুরু করল যা অপমানকর ছিল নিম্নবর্গীয় মহিলাদের প্রতি। উদাহরণ হিসাবে ধরা যায়, বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ না করার অনুমতি বা বিধবাদের ন্যাড়া থাকা ইত্যাদিও নিম্নবর্ণে প্রবেশ করল ও তারা তা অনুকরণ করা শুরু করল। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতকরণ বৈবাহিক জীবনের উপরও সুগূঢ় প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্ত্রীরা সর্বস্ব দিয়ে নিজেদের বিশ্বস্ততা ও সতীত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করত স্বামীদের কাছে। তৃতীয়তঃ সংস্কৃতকরণ অস্পৃশ্যজাতিদের প্রভাবিত করেছে মদ, গরুর মাংস, গৃহপালিত শুকরের মাংস ভক্ষণ ইত্যাদি পরিত্যাগ করতে। এর ভিত্তিতে শ্রীনিবাস বলেছেন "In the next twenty or thirty years the culture of untouchables all over the country will have undergone profound changes."

১১.৪.৩ সমালোচনা (Criticisms)

সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারণা হিসাবে সংস্কৃতকরণকে বিভিন্নভাবে সমালোচনা করা হয়েছে—

প্রথমত, এটি অভিযোগ করা হয়েছে সংস্কৃতকরণ একটি জটিল ও ভিন্নধর্মী ধারণা, শ্রীনিবাস নিজেই স্বীকার করেছেন যে সংস্কৃতকরণ কোন একক ধারণা নয়, অনেক ধারণার সংমিশ্রণ।

দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতকরণ তাত্ত্বিকভাবে আলাদা শব্দ

তৃতীয়ত, সংস্কৃতকরণ, আইনগত অর্থে সত্য প্রত্যয়মূলক ধারণা যা আদর্শ সাধারণ ও নামমাত্র সংজ্ঞার মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় বিরাজিত।

চতুর্থত, সংস্কৃতায়ন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের অনেক দিক বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়। সংস্কৃতায়ন অতীত ও সাম্প্রতিক ভারতের অনেক অ-সংস্কৃত পরিবেশকে উপেক্ষা করে।

পঞ্চমত, D. N. Majumdar তাঁর 'মোহনা' গ্রাম নিয়ে গবেষণায় দেখিয়েছেন, সেই গ্রামে নিম্ন বর্গীয়দের মধ্যে উচ্চবর্ণে উন্নীত হবার প্রতি কোন আগ্রহ বা চেষ্টা নেই। না সংস্কৃতায়ণ তাদের উচ্চবর্ণে উন্নীত হতে সাহায্য করছে।

ষষ্ঠত, Lynch বলেছেন, সংস্কৃতায়ণ একটি সংস্কৃত আবদ্ধ প্রক্রিয়া, স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে সামাজিক গতিশীলতার জন্য যে আন্দোলনগুলিই হয়েছিল তার সবগুলিই সংস্কৃতায়ন দ্বারা ব্যাখা করা সম্ভব করা সম্ভব নয়।

সপ্তমত, Chauhan সংস্কৃতায়ন থেকে বর্ধিত আচার অনুষ্ঠানকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ আচার অনুষ্ঠান অ-সংস্কৃত রীতিনীতিকে যে প্রাধান্য দেয় তা সংস্কৃতায়ন কখনই দেয় না।

১১.৫ পশ্চিমীচরণ (Westernization)

সংস্কৃতায়নের মতো পশ্চিমীকরণের ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল সামাজিক পরিবর্তন বুঝতে। আধুনিক ভারতের সামাজিক পরিবর্তন বুঝতে। আধুনিক ভারতের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন পর্যালোচনার ক্ষেত্রে পশ্চিমীকরণের ধারণাটি তাৎপর্যপূর্ণ, ভারতীয় জনজীবনে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে 'পাশ্চাত্ত্যীকরণ' ধারণাটির প্রয়োগের ক্ষেত্রে শ্রীনিবাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে দক্ষিণের কুর্গের গবেষণা করার সময়। শ্রীনিবাসের গবেষণায় এই ধারণা উঠে এসেছিল। লেখক পশ্চিমীকরণকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন "The change brought about in Indian society and culture as a result of over 150 years of British rule. The term subsuming changes occuring at different levels of technology". শ্রীনিবাসের পশ্চিমীকরণ তত্ত্বের মধ্যে সাধারণত মানবতাবাদ এবং যুক্তিবাদ অন্তর্ভুক্ত ছিল। পশ্চিমীকরণের বিস্তৃত মাত্রা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে যোগেন্দ সিং (১৯৪৪) লিখেছেন 'Emphasis on humanitarianism and rationalism is a part of westernization which led to a series of institutional and social reforms in India. Establishment of scientific, technological and educational institutions, rise of nationalism, new political culture and leadership in the country are all by products of westernization'.

শ্রীনিবাস যুক্তি দিয়েছেন পশ্চিমীকরণ প্রক্রিয়াটি সংস্কৃতায়ণকে শিথিল করে দেয়নি, প্রকৃতপক্ষে উভয় প্রক্রিয়া একসাথে চলে, আবার কখনও কখনও পশ্চিমীকরণের বৃদ্ধি সংস্কৃতায়ণ প্রক্রিয়াকে বাড়িয়ে তোলে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা পশ্চিমীকরণের প্রভাবকে ছড়িয়ে দিয়েছে এবং তীর্থস্থান ও বর্ণ সমিতির মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আধুনিক করে তুলেছে।

তিন-চার দশক ধরে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে নতুন ধরনের সাংস্কৃতিক চিন্তা ভাবনার উদয়

হয়েছে। যেসব দেব-দেবীর অবলুপ্তির পথে ছিল, তাদেরও পূর্জা অর্চনা নতুন করে শুরু হয়েছে। গোষ্ঠীর সম্বনায়ক সমিতিগুলি আরোও ভালোভাবে সংগঠিত হয়েছে। অভিজ্ঞতামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, পশ্চিমীকরণের বৃদ্ধির সাথে সাথে সংস্কৃতির বৃদ্ধি হয়েছে।

১১.৫.১ উৎপত্তি (Origin)

শ্রীনিবাস তাঁর লেখনীতে পশ্চিমীকরণের উত্থানের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। শ্রীনিবাসের অভিমত অনুসারে পাশ্চাত্তীকরণ বা পাশ্চাত্য সমাজ সংস্কৃতির প্রভাব বলতে বোঝায় ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সভ্যতা সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংগঠিত পরিবর্তন যা স্বাধীন ভারতে এখনও অব্যাহত আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও গতিময় হয়েছে। বস্তুত পক্ষে, সুদীর্ঘকালের ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন কায়েম করেছে। এই পরিবর্তন ব্যাপক, স্থায়ী ও কার্য্যকরী। ভারতবর্ষে ইংরেজরা শুধু শাসন করেনি, তাদের সাথে অনেক কিছু নিয়ে এসেছে। এইসবের মধ্যে সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশ্বাস, মূল্যবোধ প্রভৃতি। ব্রিটিশদের আমদানি করা ছাপাখানার প্রযুক্তি এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। এই ছাপাখানা দেশের মানুষের চিন্তা-চেতনা ও জীবনরীতিতে বহুমুখী ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত করেছে। ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে কিছু আমূল পরিবর্তন এনেছে। ব্রিটিশ শাসনের সূচনা হয় নতুন প্রযুক্তি, প্রতিষ্ঠান, জ্ঞান, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের মাধ্যমে। ধীরে ধীরে ঔপনেবেশিক শাসন, ভারতীয় সমজের বিভিন্ন অংশকে একীভূত করেছিল। আধুনিক ভারত প্রকৃতপক্ষে সেই সময় থেকে শুরু হয়েছে। জমি জরিপ হয়েছে, স্থির হয়েছে রাজস্ব ব্যবস্থা, নতুন আমলাতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে এবং সেইসাথে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও আইন-আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ শাসন যোগাযোগ, রেলপথ, ডাক ও টেলিগ্রাফের বিকাশ ঘটায় এবং স্কুল কলেজ শুরু করে। 'One obvious result was that books and journals, along with schools, made possible the transmission of modern, as well as traditional knowledge to large numbers of Indian knowledge which could no longer be the privilege of a few hereditary groups while the newspaper made people in different parts of the farflung country realize that they had common bonds and the events happening in the world outside influenced their lives for good or ill'.

ব্রিটিশ আমলের সময় থেকেই আরেকটি শক্তি যা পশ্চিমীকরণের ভিতকে শক্ত করার ক্ষেত্রে অনবরত কাজ করে চলেছে, তা হল খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকদের কাজ। খ্রিস্টান মিশনারিরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে আদিবাসী ও অস্পৃশ্যদের দ্বারা অধ্যুষিত অঞ্চলে কাজ করেছিল। দেশের পিছিয়ে পড়া অংশগুলি এইভাবেই পশ্চিমীকরণের সান্নিধ্যে এসেছে।

সমসাময়িক ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে, যখন আমরা পশ্চিমীকরণের কথা বলি, পশ্চিমীকরণ বিরাট পরিবর্তন এনেছে গ্রামীণ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে নিয়ে

এসছে যোগাযোগের ব্যবস্থার বিস্তৃত সীমার মধ্যে যা গ্রামগুলিকে আধুনিকীকরণের পথে অগ্রসর হতে সাহায্যে করেছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান যেমন পঞ্চায়েতি রাজ, শিক্ষার ব্যাপক প্রসার গ্রামবাসিদের পশ্চিমীকরণের দিকে নিয়ে এসেছে।

সংস্কৃতায়ণ ও পশ্চিমীকরণ ধারণার মধ্যে যা আকর্ষণীয় হল তা হল পূর্বেরটি বর্ণাশ্রমের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় এবং পরেরটি বর্ণপ্রথার বাইরে পরিলক্ষিত হয়।

১১.৫.২ বৈশিষ্ট্য (Characteristics)

পশ্চিমীকরন (Westernization) হল একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে পূর্ব বা অন্যান্য অঞ্চলের সমাজ পশ্চিমা সংস্কৃতি, জীবনধারা, প্রযুক্তি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো গ্রহণ করে। পশ্চিমীকরন সাধারণত ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সভ্যতার প্রভাব থেকে উদ্ভূত, যা প্রাচীন সমাজে আধুনিকতার আগমন ঘটিয়েছে। এই প্রক্রিয়ায়, ঐতিহ্যগত বা প্রথাগত সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে পশ্চিমা চিন্তাভাবনা, প্রযুক্তি, শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনীতি, ধর্ম এবং জীবনধারার প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে। পশ্চিমীকরনের বৈশিষ্ট্যগুলো নীচে আলোচনা করা হলো:

শিক্ষা ও প্রযুক্তি

পশ্চিমীকরনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার গ্রহণ। পশ্চিমা দেশগুলির শিক্ষা ব্যবস্থা প্রথাগত শিক্ষার তুলনায় অনেক বেশি বিজ্ঞানভিত্তিক, যুক্তিবাদী এবং বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পন্ন। পশ্চিমী শিক্ষার প্রভাব দেশের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিলক্ষিত হয়, যেখানে আধুনিক শিক্ষার উপকরণ, পদ্ধতি এবং প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে, পশ্চিমীকরনে আধুনিক যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, চিকিৎসা প্রযুক্তি, এবং অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তি দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো

পশ্চিমীকরনের ফলে ভারতের মতো দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। পশ্চিমা দেশে প্রচলিত নির্বাচনী প্রক্রিয়া, সাংবিধানিক অধিকার, আইনের শাসন, নাগরিক স্বাধীনতা, এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতি আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তাধারা, যেমন মানুষের স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার, ভোটাধিকার এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা, প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক মডেল এবং বিশ্বায়ন, যা পশ্চিমী দেশগুলির মাধ্যমে আসে, তাও সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোকে পরিবর্তন করেছে।

সংস্কৃতি ও জীবনধারা

পশ্চিমীকরনের ফলে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, বিনোদন, এবং সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পশ্চিমী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমা সমাজে আধুনিক

জীবনধারা, যেমন দ্রুত চলাফেরা, কাজের জন্য সময় দেওয়া, শপিং মল, ফ্যাশন এবং প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়ে গেছে। এর পাশাপাশি, পশ্চিমী সিনেমা, টেলিভিশন, মিউজিক, এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক মাধ্যমের মাধ্যমে পশ্চিমী সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছে। ফলে, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে পশ্চিমী রীতিনীতি, যেমন লাইফস্টাইল, ফ্যাশন, এবং মনোভাব গ্রহণ করা একটি সাধারণ প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তা

পশ্চিমীকরনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো ধর্মীয় চিন্তাভাবনা এবং দার্শনিক প্রভাব। প্রথাগত ধর্মীয় বিশ্বাসের তুলনায় পশ্চিমা সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং যুক্তিবাদী চিন্তা অধিক প্রাধান্য পায়। পশ্চিমী সমাজের আধ্যাত্মিকতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা, যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবাধিকারকে গুরুত্ব দেয়, আমাদের সমাজে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে।

বিশ্বায়ন

পশ্চিমীকরন বিশ্বায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বিশ্বায়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের ফলে পশ্চিমী দেশগুলির অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিমী দেশগুলির শিল্প, ব্যবসা, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রগতি এবং গ্লোবাল মার্কেট প্লেসের মাধ্যমে অন্য দেশগুলোও আধুনিক প্রযুক্তি ও পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

পারিবারিক কাঠামো ও সম্পর্ক

পশ্চিমীকরনের ফলে পারিবারিক কাঠামোতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। ভারতীয় সমাজে যেখানে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ছিল, সেখানে এখন পারিবারিক সদস্যরা স্বাধীনভাবে বাস করতে শুরু করেছে। পশ্চিমী সমাজের একক পরিবার ব্যবস্থা, যেখানে বাবা-মা এবং সন্তানরা আলাদা বাসস্থানে বসবাস করে, তা ভারতীয় সমাজে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছে। পশ্চিমী চিন্তাভাবনার প্রভাবে পারিবারিক সম্পর্কের ধরনও পরিবর্তিত হয়েছে, যেখানে একে অপরের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং ব্যক্তিত্বের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

লিঙ্গ সমতা ও নারীর অধিকার

পশ্চিমীকরন নারীদের অধিকারের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমতা নিয়ে এসেছে। পশ্চিমী সমাজে নারী স্বাধীনতা এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। নারী শিক্ষা, কর্মসংস্থান, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং আইনগত অধিকার বৃদ্ধির ফলে নারীরা এখন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার এবং সুযোগ পাচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায়, ভারতে নারীদের অধিকার এবং অবস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে, যদিও কিছু এলাকায় এখনও পুরনো সামাজিক ধারণা এবং নিয়মকানুন বিদ্যমান।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক মূল্যবোধ

পশ্চিমীকরনের ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মানবাধিকার ধারণার বিস্তার ঘটিয়েছে। পশ্চিমী দেশগুলিতে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি প্রবণতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে, ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারণা ও মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমী চিন্তা-ভাবনা ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা চালিয়েছে, যেখানে মানুষের বিশ্বাস এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। ভারতের মতো দেশেও ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মানবাধিকার আন্দোলন পশ্চিমী প্রভাবের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী হয়েছে।

পশ্চিমীকরন (Westernization) প্রক্রিয়া একদিকে যেমন সমাজে পরিবর্তন এবং উন্নতি নিয়ে এসেছে, তেমনি এটি কিছু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাও সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমী চিন্তাধারা এবং প্রথার গ্রহণের ফলে অনেক নতুন সুবিধা যেমন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যখাতে উন্নতি ঘটেছে, তেমনি কিছু সমস্যা যেমন, সামাজিক বৈষম্য, মানসিক চাপ, এবং ঐতিহ্যবিরোধী মনোভাবও দেখা দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে, পশ্চিমীকরনের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য এবং এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রভাব

পশ্চিমীকরনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পরিবেশের উপর প্রভাব। পশ্চিমী দেশগুলোতে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে শিল্পায়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অত্যধিক চাপ পড়েছে। ভারতে, পশ্চিমী প্রভাবের কারণে শিল্পায়ন, নগরায়ণ এবং পরিবেশের প্রতি এক ধরনের অবহেলা দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমী জীবনধারার অনুসরণে মানুষের জীবনে ভোগবাদিতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পরিবেশের ক্ষতির কারণ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অত্যধিক বিদ্যুৎ খরচ, এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সমস্যাগুলি পশ্চিমীচরণের ফলে বেড়ে গেছে।

ভাষা এবং সাহিত্য

পশ্চিমীকরন ভাষা এবং সাহিত্যেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। ইংরেজি ভাষার প্রসার এবং পশ্চিমী সাহিত্য, চলচ্চিত্র, এবং অন্যান্য সৃজনশীল শিল্পের প্রভাব ভারতীয় সমাজে ব্যাপকভাবে দেখা যায়। ভারতীয় ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষার ব্যবহার আরও বাড়ছে, যা শিক্ষা, প্রশাসন, এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ভাষা হয়ে উঠেছে। তবে, এই ভাষাগত পরিবর্তন অনেকসময় ভারতের ঐতিহ্যবাহী ভাষা এবং সাহিত্যকে ম্লান করতে পারে, এবং কিছু ক্ষেত্রে তা ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির ক্ষতি করতে পারে।

ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক পরিবর্তন

পশ্চিমীকরন ধর্মীয় চিন্তা এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলেছে। পশ্চিমী সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতা

এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য রয়েছে, যার ফলে প্রাচীন ধর্মীয় প্রথাগুলোর প্রতি মানুষের মনোভাব কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। ভারতীয় সমাজে, যেখানে হিন্দুধর্ম, ইসলাম, খ্রিস্টান ধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মের প্রভাব রয়েছে, সেখানে পশ্চিমী চিন্তা ধর্মীয় চর্চা এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছে। যদিও ধর্মীয় বিশ্বাসে কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেনি, তবে ধর্মীয় রীতিনীতি এবং আচার-আচরণের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।

সামাজিক অগ্রগতি এবং পরিবর্তন

পশ্চিমীকরনের প্রভাবে সামাজিক অগ্রগতি এবং পরিবর্তন এসেছে, তবে এই পরিবর্তনগুলি সব জায়গায় সমানভাবে দেখা যায়নি। শহরাঞ্চলে যেখানে আধুনিকীকরণ, উন্নত শিক্ষা, এবং প্রযুক্তির ব্যবহার প্রবল, সেখানে গ্রামীণ অঞ্চলে এখনও ঐতিহ্যগত এবং প্রথাগত চিন্তাভাবনা শক্তিশালী। পশ্চিমী প্রভাবের ফলে শহুরে জীবনধারায় বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, উদারতা এবং সমতার ধারণা বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে গ্রামে পুরনো মূল্যবোধ এবং সামাজিক অবস্থা এখনও দৃঢ়ভাবে প্রতিস্থাপিত রয়েছে। এই অসামঞ্জস্যতা সমাজে একটি বৈষম্যমূলক বিভাজন তৈরি করতে পারে, যা ভবিষ্যতে সমাজের স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

অধিকার ও নাগরিক সচেতনতা

পশ্চিমীকরন নাগরিক অধিকার এবং সামাজিক সচেতনতার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। পশ্চিমী দেশগুলির মতো, ভারতে মানুষ এখন অধিকারের বিষয়ে সচেতন হচ্ছে। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, যেমন, স্বাধীনতা, সুরক্ষা, সমতা এবং ব্যক্তিগত অধিকার সংরক্ষণে আইনগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এই অধিকারগুলোর প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা সমাজে মানুষের সচেতনতা এবং সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তি তৈরি করেছে। পশ্চিমী চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, ভারতীয় সমাজে অধিকারের বিষয়ে আরো স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছে, যার ফলস্বরূপ জনগণের মধ্যে এক নতুন ধরনের সামাজিক সচেতনতা দেখা যাচ্ছে।

১১.৬ মানবতাবাদের প্রবর্তন (Humanitarianism)

পশ্চিমীকরণের প্রভাব বলতে কতকগুলি মৌলিক মূল্যবোধের প্রবর্তনকে বোঝায়। এ রকম একটি মুখ্য মূল্যবোধ হল 'মানবিকতাবাদ' (Humanitarianism)। মানবিকতাবাদ বলতে জাতি, ধর্ম, নারী-পুরুষ, বয়স, অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে সকল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধানের জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা। "A most important value, which in turn subsumes several other values, is what may be broadly characterised as humanitarianism, by which is meant an active concern for the welfare of all human beings, irrespective of caste, economic position, religion, age and sex". ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশ সরকার মানবিকতাবাদী, বিবিধ সংস্কারমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ব্রিটিশ আমলে ভারতে মানবিকতাবাদ ও যুক্তিবাদ ক্রমান্বয়ে অধিকতর ব্যাপক, গভীর ও

শক্তিশালী হয়েছে। শ্রীনিবাস যুক্তি দিয়েছেন, 'মানবতাবাদ' শব্দের পরিধিব্যাপক। এটির অন্যান্য অংশের সাথে যুক্ত হয়েছে মূল্যবোধ, যেখানে প্রাধান্য পাচ্ছে সকলের কল্যাণ ।

সমতাবাদ (Equalitarianism)

পশ্চিমকরণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সমতাবাদ। এর গণতান্ত্রিক মূল্য অপরিসীম। সমতাবাদ বৈষম্য হ্রাস করতে, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সকলের স্বাধীনতার জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। মানবতাবাদ যেমন পশ্চিমীকরণের বৈশিষ্ট্য ঠিক তেমনি সমতাবাদ সমসত্ত্ব সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)

ব্রিটিশ সরকার ও পরবর্তীকালে ভারতীয় সংবিধান ভারতকে ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে অভিষিক্ত করে। যুক্তিবাদী ও আমলাতান্ত্রিক সমাজে ভারতবর্ষকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতি হিসাবে কল্পনা করা হয়। সমাজে অবস্থিত সকল ধর্মগুলির প্রতি রাষ্ট্রের সকলের শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন।

সামাজিক সংস্কারের সূচনা

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় অবস্থিত সামাজিক কুফল যা ভারতীয় সমাজকে ধ্বংস করছিল, তার বুকে কঠোরভাবে আঘাত হানে। বৈষম্য সৃষ্টিকারী হিন্দু ও মুসলিম আইন শাস্ত্রের অংশগুলিকে ব্রিটিশ সরকার আইন প্রবর্তন করে তার পতন ঘটান। সতীদাহ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, পর্দা প্রথা ইত্যাদির অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমীকরণ সাম্যবাদ ও ধর্ম নিরপেক্ষকরণের সূচনা ঘটিয়েছিল।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রাধান্য

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা ভারতীয় সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রচলন করে। রেল, বাষ্পইঞ্জিন এবং প্রযুক্তি ভারতের মানচিত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটায়। এর ফলে ভারতীয় সমাজ শিল্পায়ণের দিকে আগ্রহী হয়ে ওঠে। যদিও শিল্পায়ণ গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় আঘাত হানে, ও নগরায়ণ ত্বরান্বিত হয়। গ্রাম থেকে লোকজন শহরের প্রতি ধাবিত হয় ও শহরে অভিবাসনও বাড়ে। এই সময় ভারতীয় সমাজ ঐতিহ্য থেকে আধুনিকতার প্রতি উৎসাহী হয়ে উঠছিল। শিল্পায়ণ ও নগরয়ণের যুগ্ম প্রভাবে সমাজে নতুন মূল্যবোধের সূচনা হয়। ঐতিহ্যবাহী অনেক প্রতিষ্ঠানকে অস্পৃশ্য ও বর্ণের মত ব্যাথায় অ্যাখারিত করা হয়।

স্পষ্টতই, পশ্চিমীকরণ ধারণাটির মাধ্যমে M. N. Srinivas ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় সমাজে যে পরিবর্তন এসেছিল তাকে বোঝাতে চেয়েছেন। স্বাধীন পরবর্তী ভারতবর্ষে পশ্চিমীকরণ ত্বরান্বিত হয়েছিল। ভারতীয় সমাজ অন্যান্য দেশের সংস্পর্শে এসেছিল। এছাড়াও মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের সমাজ ব্যবস্থা আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে শ্রীনিবাস আধুনিকায়নের প্রভাবের দিকে তাকিয়ে ধারণাটির পর্যালোচনা করার পরামর্শ দিয়েছেন। জানিয়েল লার্নার পশ্চিমীকরণ এবং আধুনিকীকরণের

মধ্যে আধুনিকীকরণকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন।

আধুনিকীকরণের মধ্যে নগরায়ণও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আধুনিকীকরণ প্রচার মাধ্যম ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সক্রিয়তা অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছিল। 'Modernization also implies social mobility. A mobile society has to encourage nationality for the calculus of choice which shapes individual behaviour and condition it rewards. People come to see the social future as manipulable rather than ordained and their prospects in terms of achievement rather than heritage.'

আমরা যদি শ্রীনিবাসের সংস্কৃতিকরণ ও পশ্চিমীকরণের ধারণা প্রত্যক্ষ করি, দেখব, গ্রামীণ পরিবর্তনের মূল্যায়ণে পশ্চিমীকরণের তেমন উল্লেখযোগ্য প্রভাব নেই। সংস্কৃতায়ণ ও পশ্চিমীকরণের মূল্যবোধের আধিপত্য বেশি। এগুলো নির্দিষ্ট কিছু মতাদর্শও বহন করে। যোগেন্দ্র সিং যুক্তি দেন পশ্চিমীকরণ শব্দটির ব্যবহার ভারতীয় অভিজাতদের জন্য নিন্দনীয়। পশ্চিমীকরণের জায়গায় আধুনিকীকরণকে বেশি গ্রহণায় বলে মনে করেছেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন—

modernization in India cannot be adequately accounted for by a term like westernization. Moreover, for many new elites in India as also in the new states of Asia, the term westernization has a pejorative connotation became of its association with former colonial domination of these country by the west. It is, therefore, more value loaded than the term modernization which to us appears a better substitute.

১১.৭ বিশ্বায়ন (Globalisation)

'বিশ্বায়ণ' শব্দটি সমাজবিজ্ঞানীদের হাত ধরে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছে। যদি অর্থনীতি বিশ্বায়ণকে ত্বরান্বিত করে তবুও এর সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। উদাহরণ হিসাবে, George Ritzer বলেছেন বিশ্বায়ণ খুব দ্রুতগতিতে বিশ্বব্যাপী সমাজের একাত্মকরণ ও সমাজ এবং সংস্কৃতির পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে বৃদ্ধি করেছে। Scholte বিশ্বায়ণকে বলেছেন deterritorialization যার অর্থ হল আঞ্চলিকতা মুক্ত পৃথিবী বা বলা যেতে পারে 'superterritorial' আঞ্চলিকতার বহুল বিস্তৃতি যা বিশ্বের সব মানুষকে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ করতে সাহায্য করেছে। বিশ্বায়ণ বলতে সমাজের সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন বোঝায়, Albow বিশ্বায়ণ বলতে গিয়ে বলেছেন, 'all those process by which the peoples of the world are incorporated into a single society, global society.' Ronald Robertson এর ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, 'Globalisation as a concept refers both to the compression of the world and the intensification of consciousness of the world as a whole'.

Anothony Guiddens, 'Globalisation can thus be defined as the intensification of worldwide social relartions which link distant localities in such a way that local local happenings are

shaped by events occuring many miles away and vice versa.'

Water বিশ্বায়ণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'a social process in which the constraints of geography on economic, political, social and cultural arrangements recede, in which people become increasingly aware that they are receding and in which people act accordingly.'

Held সহ অন্যান্যরা বলেছেন, "Globalization can be thought of a process (or set of processes) which embodies a transformationin the spatial organization of social relations and transactions assessed in terms of their extensity, intensity, velocity and impact generating transcontinehtal or interregional flows and networks or activity, interaction and the exercise of power." V. Beack, globality "globalism" এবং 'globalization' মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করতে গিয়ে বলেছেন 'globality' বলতে বোঝায় ব্যক্তিবিশেষ যখন পৃথিবী নায়ক সমাজে বসবাস করে। যার ফলে কাটাতারের বেঁড়া, দেশের পরিসীমা ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য "globalism" দেখা হয় পৃথিবীকে একটি বাজার হিসাবে (world market) যেটি যথেষ্ট শক্তিশালী (স্থানীয় ও জাতীয় এবং যেটা রাজনীতি ও রাজনৈতিক দ্বারা নির্ধারিত হয়। আর বিশ্বায়ণ হল 'the process through which sovereign national states are criss crossed and undermined by transational actors and varying prospects or power, orientation indentities and networks'.

১১.৭.১ বিশ্বায়ণের বৈশিষ্ট্য (Distinctive Characteristics of Globalisation)

১. সীমান্তহীন বিশ্ব (Borderless World)

বিশ্বায়নের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল 'সীমান্তহীন' বিশ্বের ধারণা। ধারণাটি এসেছে "borderless world" যার রাজনৈতিক অর্থ হল "deterritorialization". "Deterritorilization" এর অর্থ হল যে সব আঞ্চলিক উপাদানসমূহ বিশ্বায়ণের উপর আঘাত হানে, তার গুরুত্বকে খর্ব করে দেওয়া, সারা পৃথিবীকে একটি ক্ষুদ্র গোলকে পরিণত করে দেওয়া। যে আঞ্চলিক ব্যবস্থা, দেশের ভৌগলিক গঠন ও সীমা এবং এর বিভিন্ন উপাদান শত শত বছর ধরে দেশের মৌলিক উপাদান, পরিচিতি তৈরি করেছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রভাবিত দেশগুলি সেই মৌলিক কাটামোয় পরিবর্তন অনুভব করে। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন পণ্য, সেবা এবং অর্থ ও তথ্যের আদান প্রদান ঘটছে। আন্তর্জাতিক ভ্রমণ, কৃষ্টি, ঐতিহ্য সংযোগ সাধনকরে আজ জীবনের সাধারণ দিকগুলিকে তুলে ধরেছে। কিছু বিশ্লেষক মনে করেন যে বিশ্বায়ণ বিশ্বায়ণ দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে অনেকাংশ ঝাপসা করে দিয়ে 'borderless world' বাড়াতে অনেকাংশ সাহায্য করেছে। সুতরাং, বিশ্বায়ণ ভূ-রাজনৈতিক সীমানার পতন ঘটায় ও জাতির মধ্যে দূরত্ব সংকুচিত করে। বিশ্বায়ণের এটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

২. উদারনীতিকরণ (Liberalisation)

বিশ্বায়ণ ও উদারনীতিকরণ সম্পর্কটি একে অপরের সাথে ওতপ্রতোভাবে জড়িত। উদারনীতিকরণ / উদারীকরণ বিশ্বায়ণকে ত্বরান্বিত করেছে। উদারীকরণের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতিগুলি শিথিল হয়েছে এবং বিশ্বঅর্থনীতির সাথে দেশের অর্থনীতি আজ এক মঞ্চে উপস্থিত। বিশ্বায়ণ ও উদারীকরণ উভয়ের ফল হল আধুনিকীকরণ, উদারীকরণ হল শিল্প, অর্থনীতিকে মুক্তকরণের এক প্রক্রিয়া। বিনিয়োগ, আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা, রপ্তানি ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের অপসারণ বোঝায়। উদারীকরণ সাধারণত ব্যাণিজ্য, অর্থনীতি বা পুঁজিবাজারের সাথে সম্পর্কিত। বাণিজ্য উদারীকরণ বলতে বোঝায়, আমদানি বা রপ্তানির উপর বিধিনিষেধ কমানো ও মুক্ত বাণিজ্য সহজতর করা। অর্থনৈতিক উদারীকরণ বলতে সাধারণত, বিশেষ করে বেসরকারী সত্ত্বাকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ গ্রহণের অনুমতি দেওয়াকে বোঝায় এবং মূলধন বলতে ঋণ ও শয়ার বাজারের উপর আরোপিত বিধিনিষেধকে হ্রাস করা বোঝায়। এইভাবে উদারীকরণ শিল্পপতি / ব্যবসায়ীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথেষ্ট স্বাধীনতাপ্রদান করে। উদারনীতিকরণ নীতি ছাড়া বিশ্বায়ণ সম্ভব নয়।

৩. মুক্ত বাণিজ্য (Free Trade)

মুক্ত বাণিজ্য উদার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূর্তপ্রতীক। সহজভাবে বলতে গেলে, বিশ্বায়ণ একটি প্রক্রিয়া হল যা বিচ্ছিন্ন আঞ্চলিক ধারণা থেকে সমষ্টিগত বিশ্বের তাৎপর্যকে ত্বরান্বিত করে। বিশ্বায়ণ একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়া যা অর্থনীতি, রাজনীতি, ধারণা, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের বৃহত্তর পরিবর্তন ঘটায়। আন্তর্জাতিক পূর্বোল্লিখত ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতার মাধ্যমে মূল্যবোধ ও জ্ঞানের বিনিময়ের মাধ্যমে বিশ্বায়ণকে ত্বরান্বিত করে। দেশগুলির মধ্যে অবাধ বাণিজ্য, সীমান্তের মধ্যে পুঁজির সহজ চলাচল, বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে অবাধ বাণিজ্যনীতির পথ সুপ্রশস্ত হয়। এর ফলে ছোট ব্যবসা ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলির বৃদ্ধি হয়, বিশ্বজুড়ে নতুন বাজারের সৃষ্টি হয়। যা দেশ ও মহাদেশগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরোও উন্নত করে তোলে।

৪. অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বিশ্বায়ণ (Globalization of Economic Activities)

এই প্রক্রিয়ার ফলে বিশ্বায়ণ আরোও প্রসারিত হয়, এর গতি, তীব্র হয় ও বিশ্বব্যাপী আন্তঃসংযোগ হল—

প্রথমত, এটি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে সীমান্ত, অঞ্চল ও মহাদেশের মধে আরোও সুদৃঢ় বন্ধন তৈরিতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয়ত, এটির তীব্রতা ক্রমবর্ধমান মাত্রা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

তৃতীয়ত, এটি বিশ্বব্যাপী মিথষ্ক্রিয়া ও প্রক্রিয়াগুলির গতি বৃদ্ধির সাথে যুক্ত করা যেতে পারে যেমন

বিশ্বব্যাপী পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটায় ও তাকে ত্বরান্বিত করে। পারস্পরিক ধারণা, পণ্য, তথ্য, অভিবাসন, সংস্কৃতি প্রভৃতির আন্তঃসংযোগ প্রবাহ বাড়ায়। এবং চতুর্থ, এটি বিশ্বব্যাপী সংযোগ, মিথষ্ক্রিয়ার গতি বাড়াতে সাহায্য করে। এই অর্থে, দেশীয় বিষয় ও বৈশ্বিক বিষয়গুলির মধ্যে সীমানা ক্রমবর্ধমান হয়ে ওঠে। তরল বিশ্বায়ণ বলতে বিশ্ব অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান আন্তঃনির্ভরশীলতাকে বোঝায়।

নিম্নে অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া আরোও যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্বায়ণের আছে তা উল্লেখ করা হল—

১. বিশ্বায়ণ একটি সার্বজনীন প্রক্রিয়া হলেও সবক্ষেত্রে এর প্রভাব সমান নয়। এটি একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াও।

২. বিশ্বায়ণ উন্নয়ণমূলক হওয়ার সাথে সাথে সমাজের জন্য ক্ষতিকারক প্রক্রিয়া।

৩. বিশ্বায়ণ একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া।

৪. বিশ্বায়ণ একটি অপরিবর্তনীয় প্রক্রিয়া।

৫. বিশ্বায়ণ সঙ্করজাত, একাজাতিকরণ ও সম্বন্বায়ক প্রক্রিয়া

৬. বিশ্বায়ণ বিচ্ছুরণের দিকে পরিচালিত করে।

৭. বিশ্বায়ণ একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া।

৪. বিশ্বায়ণ আদ্যপ্রাপ্ত একটি প্রক্রিয়া (Top down prcess)।

৯. বিশ্বায়ণ একটি বিরাষ্ট্রীকরণ প্রক্রিয়া

১১.৭.২ বিশ্বায়ণের মাত্রা (Dimension of Globalisation)

১. বিশ্বায়ণের অর্থনৈতিক মাত্রা

২. বিশ্বায়ণের সামাজিক মাত্রা

৩. বিশ্বায়ণের রাজনৈতিক মাত্রা

৪. বিশ্বায়ণের প্রযুক্তিগত মাত্রা

৫. বিশ্বায়ণের সাংস্কৃতিক মাত্রা

৬. বিশ্বায়ণের সার্বিকমাত্রা

১১.৭.৩ বিশ্বায়ণের পক্ষে যুক্তি (Arguments in favour of Globalisation Include)

যে সব দেশের অর্থনীতি বিশ্ব অর্থনীতির সাথে বেশি জড়িত তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো অন্যান্য দেশের তুলনায় যার বিশ্ব অর্থনীতির সাথে জড়িত নয়, তাদের থেকে প্রায় গড়ে ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক বৃষ্টিতে খুব দ্রুত হয়েছ ও মানুষের জীবনযাপনের মাত্রাও উন্নত হয়েছে। উন্নত সম্পদ, উন্নত স্বাস্থ্য সেবা, বিশুদ্ধ পানীয় সবই বিশ্বয়ণের ফল।

দেশে বিদেশী বিনিয়োগ বেড়েছে এবং দোশের অগ্রগতিতে ইন্ধন জুগিয়েছে।

বিশ্বায়নের ফলে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, দেশগুলির মধ্যে অন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নতদেশগুলির আধিপত্য হ্রাস পেয়েছে, যুদ্ধভীতি হ্রাস হয়ে শন্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উন্নত প্রযুক্তিব্যবস্থা দ্রব্যমূল্যের দামের হ্রাস ঘটিয়েছে এবং পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে।

বয়স্ক লোকদের স্বাক্ষরতার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে।

গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আধুনিক যোগাযোগ এবং বিশ্বব্যাপী বিস্তার অগণতান্ত্রিক শাসনকে পতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

বহুজাতিক সংস্থাগুলি উন্নত কার্য্যক্ষেত্র ও ভালা পারিশ্রমিক দিচ্ছে দেশীয় সংস্থাগুলির থেকে।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়াকে আরোও ত্বরান্বিত করেছে। অন্য সংস্কৃতির প্রতি সম্মানবোধ তৈরি করে যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরোও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

১১.৭.৪ বিশ্বায়ণের বিরুদ্ধে যুক্তিগুলির মধ্যে আছে—

বিশ্বায়ণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক খরচ খুব বেশি, ফলে বিশ্বায়ণের সুবিধা নিতে অক্ষম দেশগুলি আরও পিছিয়ে পড়ে।

বিশ্বব্যাপী ধনী দরিদ্রের বিভাজন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাণিজ্য ও ভ্রমণের বিস্তারের ফলে AIDS এর মত রোগগুলির বিস্তার বেড়েছে।

দেশগুলির বর্ধিত পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৃহত্তর দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। যেমন— সারা বিশ্বজুড়ে মন্দার বাজার তৈরি হয়েছে।

জাতিগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণত হ্রাস পেয়েছে।

বিশ্বায়ণের ফলে পরিবেশের অনেক হানি হয়েছে। উন্নত দেশগুলি কাঁচামালের উৎস হিসাবে অনুন্নত

দেশগুলির পরিবেশকে নির্বিচারে ধ্বংস করেছে। এখন পর্যন্ত আবাস যোগ্য গ্রহ পৃথিবীকে বিশ্বায়ণ ধীরে ধীরে বসবাসের জন্য অযোগ্য অনিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত করেছে।

প্রধান অর্থনৈতিক শক্তিগুলি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে উন্নয়ণশীল বিশ্বের উপর আধিপত্য স্থাপন করেছে। সারা বিশ্বজুড়ে একধরনের অর্থনৈতিক উপনিবেশ স্থাপনের কাজ চলছে। তারা উন্নয়ণশীল দেশগুলিকে নিজের অংশীদার হিসেবে নয়, পরজীবী হিসাবে বিবেচনা করে।

বাণিজ্যের উদারীকরণ বোকরত্বকে আরোও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, অভিবাসনের চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছে। কাজের খোঁজে কম উন্নয়ণশীল দেশগুলি থেকে বড় সংখ্যার মানুষ কাজের আশায় উন্নত দেশগুলিতে পাড়ি দিচ্ছে ফলে আরও বেশি মানব পাচার বাড়ছে।

বিশ্বায়ণ 'Brain Drain' এর ধ্বনিকে আরোও ত্বরান্বিত করছে।

আধুনিক সমাজে বিশ্বায়ণের ফলে আদিবাসী ও জাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতিগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বায়ণের ফলে সীমান্ত সন্ত্রাস, পাচার ইত্যাদি বহুল পরিমাণে বেড়েছে।

১১.৮ সারসংক্ষেপ

সংস্কৃতায়ন, পশ্চিমীকরণ ও বিশ্বায়নের ফলে সমাজে ভারতীয় বিবিধ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এদের বহুমখী, প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হচ্ছে, সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে। তবে দেশের স্বার্থ, দেশের অগ্রগতি যাতে কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেই দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে হয়।

১১.৯ মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী

১. সংস্কৃতিকরণ ধারণাটি কার দ্বার বিকশিত হয়েছিল?

২. সংস্কৃতিকরণ ধারণাটি কথার ধারণা কি?

৩. সামাজিক পরিবর্তনে সংস্কৃতীকরণের প্রভাব কি?

৪. সংস্কৃতীকরণের দুটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৫. শ্রীনিবাস কিভাবে পাশ্চাত্তীকরণকে বর্ণনা করেছেন?

৬. পাশ্চাত্তীকরণের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৭. সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব কি?

১১.১০ অভিসম্বন্ধ (Reference)

Agarwal, J. C (2002) Theory and Principles of Education (13th ed.) New Delhi; Vikash Publishing House.

Bhatia, K & Bhatia, B. D (1992) Theory and Principles of Education (20th Ed.) Delhi; Doaba House.

Bhattacharya, D. C (1996). Sociology (6th ed.) Cacutta Vijoya Publishing House.

Pandey, R.S (2009). Principals of Education (13th Ed.) Agra-2, Agrawal Publications.

Ravi, S. S (2015) A comprehensive study of Education (2nd Ed.) Delhi; PHI Learning Sharma, Y. K. (2016) Foundation in Sociology of Education, Delhi; Kaniska Publishers.

Saxena, N.R.S (2009) Principles of Education Meerut; Vinay Rakhija.

অধ্যায় ১২ ❑ সামাজিক সংযোগ : আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক (Social Communication : Formal and Informal)

১২.১ উদ্দেশ্য

১২.২ ভূমিকা

১২.৩ সামাজিক সংযোগের ধারণা

১২.৪ আনুষ্ঠানিক সামাজিক সংযোগ

১২.৫ অনানুষ্ঠানিক সামাজিক সংযোগ

১২.৬ সারসংক্ষেপ

১২.৭ স্বমুল্যায়ণ প্রশ্নপত্র

১২.৮ অভিসম্বন্ধ

১২.১ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায় পড়ার পর ছাত্র-ছাত্রীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবগত হবেন—

- সামাজিক সংযোগ বলতে কি বোঝায়
- অনানুষ্ঠানিক সামাজিক সংযোগ ও আনুষ্ঠানিক সামাজিক সংযোগ বলতে কি বোঝায়?

১২.২ ভূমিকা

সামাজিক সংযোগ, সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেই এক ব্যাক্তির সাথে অন্য ব্যক্তির সংযোগ সাধন করে। সামাজিক সর্মক, সামাজিক চলন, সামাজিক পরিবর্তন সাধন সকল ক্ষেত্রেই সামাজিক সংযোগের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। মানুষ বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ থেকে সারাজীবন কাটাতে পারে না। দুটি মানুষের সামাজিক সংযোগের দরুনই সামাজিক সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও সামাজিক পদ্ধতি পরিবর্তিত হয় এবং সমাজ উপযোগী ভাবে গড়ে ওঠে।

১২.৩ সামাজিক সংযোগের ধারণা

সামাজিক যোগাযোগ বলতে মৌখিক, অমৌখিক সংকেতের ব্যবহার, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং সামাজিক জ্ঞান কে বোঝায়। সমাজে অবস্থিত দুটি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে

সামাজিক যোগাযোগের গুরুত্ব অপরিসীম। দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক বিনিময়কে সামাজিক যোগাযোগ বলে। এই যোগাযোগ গুলির উপর ভিত্তি করে সামাজিক কাঠামো ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। যোগাযোগের মাধ্যমে তৈরি সামাজিক নিয়ম নীতি, সংস্কৃতির পরিবেশে আমরা বেঁচে থাকি। সামাজিক যোগাযোগ সমাজের মৌলিক উপাদান। সমাজের অস্তিত্ব সামাজিক যোগাযোগের মধ্যে নিহিত থাকে। দুটি মানুষের সামাজিক সম্পর্কের উপর সামাজিক যোগাযোগ কিছু নির্দিষ্ট প্রভাব তৈরি করে, যা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এটি মানুষের মধ্যে মানসিক সম্পর্ক স্থাপন করে। যোগাযোগ মৌখিক হতে পারে বা বিভিন্ন শারিরীক ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে যেমন শরীরের নড়াচড়া, মুখের অভিব্যক্তি, অঙ্গভঙ্গি চোখের যোগাযোগ ইত্যাদি।

যোগাযোগ দুই প্রকার

(i) আনুষ্ঠানিক সামাজিক যোগাযোগ (Formal Communication)

(ii) অনানুষ্ঠানিক সামাজিক যোগাযোগ (Informal Communication)

১২.৪ আনুষ্ঠানিক সামাজিক সংযোগ (Formal Communication)

পূর্বনির্ধারিত নিয়মাবলী, মাধ্যমের দ্বারা অফিসিয়াল তথ্যের প্রবাহকে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলা হয়। তথ্যের সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত করা হয় এবং তা সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টার মাধ্যমে সঠিকভাবে সরবরাহ করা হয়। আনুষ্ঠানিক সামাজিক যোগাযোগ একটি শ্রেণীবদ্ধ কাঠমো অনুসরণ করে ও আদেশের পালাক্রমে পালন করা হয়। বিভিন্ন বিভাগের সংস্থার ঊর্ধতন কর্মীদের ও নেতাদের থেকে কাঠামোটি সাধারণত উপরে থাকে যা সংস্থার নিম্নস্তরের কর্মীদের মাধ্যমে নিচে চলে যায়। কর্মচারীরা তাদের দায়িত্বপালন করার সময় আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ চ্যানেল অনুসরণ করতে বাধ্য থাকে। অনুষ্ঠানিক যোগাযোগ কার্যকরী বলে বিবেচিত হয় কারণ, এটি একটি সময় উপযোগী ও পদতিগত যোগাযোগ ব্যবস্থা।

১২.৫ অনানুষ্ঠানিক সামাজিক সংযোগ (Informal Communication)

তুলনামূলকভাবে, অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলতে বোঝায় বহুমাত্রিক যোগাযোগ। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ অবধি এবং তা কোন নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ নয়। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ দ্রুত, প্রকৃত, অনেক বেশি সম্পর্কযুক্ত এবং যোগাযেগের খুব স্বাভাবিক রূপ। মানুষ একে অপরের সাথে অবাধে যোগাযোগ করতে পারে এবং অন্তরঙ্গতার পরিবেশ গড়ে ওঠে। তার পরস্পরের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারে ও যা কাজের জগতের বাইরেও সম্প্রসারিত। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ প্রকৃতিতে সহজাত। এটি উৎপাদনশীলতা গড়ে তুলতে সাহয্য করে এবং কর্মীদের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

এখানে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের কিছু পার্থক্যের সংক্ষিপ্ত তালিকা তুলে ধরা হল—

আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ হল নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা যেহেতু একটি কাগজের পথ আছে। এর তুলনা, অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ হল তুলনামূলক কম নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা কারণ এর কথা কাগজে লেখা অসম্ভব।

আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ধীর, আমলাতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এটি কখনও কখনও অসহনীয়ভাবে ধীর। অন্যদিকে অনানুষ্ঠ নিক যোগাযোগ খুব দ্রুত এবং প্রায়শই তাৎক্ষণিক।

বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে অনুষ্ঠানিক যোগাযোগ সম্পূর্ণ করা হয়, যেখানে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের জন্য প্রয়োজন খুবই সামান্য প্রক্রিয়া।

আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য শুধুমাত্র পূর্বনির্ধারিত যোগাযোগ পদ্ধতির মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। যেখানে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ মাধ্যমে তথ্য অবাধে চলে।

আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের সাথে গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়, যেখানে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যক্তির উপর নির্ভরতার কারণে সম্পূর্ণ গোপণীয়তা বজায় রাখা কঠিন হয়ে ওঠে।

১২.৫.১ আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের ধরন

- স্মারকলিপি
- ব্যক্তিগত যোগাযোগ ব্যবস্থা
- মিটিং
- সম্মেলন
- একজনের সাথে একজনের মুখোমুখি আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ
- সংবাদ
- চিঠিপত্র
- উপস্থাপনা
- বৃক্ততা
- নোটিশর্কেড
- সাংগঠনিক ব্লগ
- ম্যানেজার ও নেতাদের

১২.৫.২ অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের ধরন

Single Strand— কোন ফর্ম ফিলাপের মাধ্যমে তথ্যের আদান প্রদান

Probability Chain— একজন ব্যক্তি অন্যকে একই তথ্য আদান প্রদান করে।

Cluster— এক গোষ্ঠী থেকে কোন খবর অন্য গোষ্ঠীতে ছড়িয়ে যায়।

১২.৬ সারসংক্ষেপ

সমাজের সচলতার চাবিকাঠি সামাজিক যোগাযোগের হাতে নিহীত থাকে। যে সমাজে সমাজিক যোগাযোগ যত বেশি গতিশীল, সক্রিয়, সেই সমাজের অগ্রগতির আরও দ্রুত।

১২.৭ স্বমূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

১. সামাজিক যোগাযোগ বলতে কি বোঝেন?

২. সমাজে সামাজিক যোগাযোগ কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

৩. আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলতে কি বোঝেন?

৪. অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ কি?

৫. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের দুটি করে মাধ্যম সম্বন্ধে বলুন।

৬. আনুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের দুটি পার্থক্য উল্লেখ করুন।

১২.৮ অভিসম্বন্ধ (Reference)

Bhattacharya, D. C (1996). Sociology (6th ed.) Cacutta. Vijoya Publishing House.

Garvey, J (2019). Blog Employees (Web Blog Post) Retrieved from https://www.peoplegoal.com/blog/what-is-formal-and-informal-communication

Mondal. P (Year?) Westernization Origin and characteristics of Westernization Retrieved from: https://www.yourarticlelibrary.com/sociology/rural sociology/westernisation-orgin-andcharacteristic-of-westernisation/31941

Rao, Shakar, C.N. (2012) Sociology (7th ed.). Mangalore Karnataka: S. Chand & Company Pvt. Ltd.

Y. K. (2016) Foundation in Sociology of Education. Delhi: Kanishka Publishers.

পর্যায় ৪

Indian Social Ethos

একক ১৩ ❑ বহুত্ববাদী সমাজ হিসাবে ভারতবর্ষ (Indian as a Pluralistic Society)

গঠন

১৩.১ উদ্দেশ্য

১৩.২ ভূমিকা

১৩.৩ বহুত্ববাদী সমাজ হিসাবে ভারতবর্ষ

১৩.৪ সারাংশ

১৩.৫ স্বমূল্যায়ণ প্রশ্নপত্র

১৩.৬ অভিসম্বন্ধ

১৩.১ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায় পড়ার পর ছাত্র ছাত্রীদের বহুত্ববাদী ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে ধারণা তৈরি হবে।

১৩.২ ভূমিকা

ভারতীয় সমাজ কাঠামোতে প্রধান প্রধান বিভাজন ও উপবিভাজনের চেহারা বেশ জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। ভারতবর্ষ সেই অতীতকাল থেকেই আক্ষরিক অর্থে এক বহুত্ব বিশিষ্ট সমাজ, Unity in Diversity ভারতীয় সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক কাঠামোর গতিপ্রকৃতি ভিন্ন। সেইসাথে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী সময়ের সাথে নিজেদের পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের সামাজিক অবস্থান ক্রমাগত পরিবর্তন করে। তাছাড়া ভারতীয় সমাজে সামাজিক স্বীকৃতি যেসব লক্ষণ আছে। সময়ের সাথে সাথে তাদের গুরুত্বের হ্রাস ও বৃদ্ধি ঘটে। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ই.পি. টম্পসন বলেছিলেন, পৃথিবীর সব সমধর্মী বৈশিষ্ট্য এই সমাজের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে .... পূর্ব বা পশ্চিমের এমন কোন চিন্তা নেই, যা কোন না কোন ভারতীয়র মনে সক্রিয় নেই।

১৩.৩ বহুত্ববাদী সমাজ হিসাবে ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এবং বৈচিত্র্যময় দেশ, যেখানে বহু শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও জাতির মানুষ একসঙ্গে বসবাস করছে। ভারতের সমাজ কাঠামো বহুত্ববাদী (Pluralistic) চরিত্রের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, রীতি-নীতি এবং

ধর্মবিশ্বাস বজায় রেখেও পারস্পরিক সহাবস্থান করে আসছে। এই বৈচিত্র্যময় সমাজ ব্যবস্থা ভারতকে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে, যা একদিকে যেমন সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে, তেমনই অপরদিকে সহনশীলতা ও সামাজিক সংহতির মাধ্যমে দেশকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছে।

বহুত্ববাদী সমাজ এমন এক ধরনের সমাজ যে সমাজে বহু ভাষাভাষী, সংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবধারায় মানুষ বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে বিদ্যালয়ের শ্রেণীগুলিতে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাষাভাষি ছাত্র-ছাত্রীরা একসাথে লেখাপড়া করে। অধিকাংশ সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন বহুত্ববাদী সমাজ পরিবেশ ও অর্থনীতির মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করে কিন্তু ১৯৫৮ খ্রিঃ সমাজ বিজ্ঞানী স্মিথ এই ধরনের সমাজের সমালোচনা করেন। তার মতে বহুত্ববাদী সমাজে শুধু বৈষম্যকেই তুলে ধরে ঐক্যের বার্তা দেয় না। ১৯৬৭ সালে ডাল থিওরীতে বলেন বহুত্ববাদী সমাজ শ্রম বিভাজন ও ক্ষমতার বিভাজনকে স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেন। বহুত্ববাদী সমাজের সুবিধা হলো প্রত্যেকের মত মতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং অন্যান্য সিস্টেম এর মতো নতুন করে বিভাজনের জন্ম দেয় না।

শ্রেণী বিভাজন সর্বত্র একইরকম কিনা এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক আছে, একদল মনে করেন যে বহুত্ববাদী সমাজের শ্রেণী বিভাজন অর্থনৈতিক পার্থক্যকে নির্দেশ করে, অপরদিকে অন্য বিজ্ঞানীরা মনে করে বহুত্ববাদী সম্বন্ধে মানুষ অর্থনৈতিক, শ্রেণীগত বা অন্যান্য বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও একত্রে বসবাস করেন।

ভারতবর্ষে বহুত্ববাদী সমাজে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিফলিত হয়। প্রায় ২৪০০ ধরনের কাস্ট আছে ভারতীয় সমাজে, আছে বহু ধর্মও তবুও ভারতীয়রা একে অপরের সাথে এক ব্যক্তি হিসাবেই মেশে। আরও বলা যায় যে একই ইন্সটিটিউট এ বিভিন্ন ধর্মের লোক একসাথে কাজ করতে পারে। লেবানন-এ সিয়া ও সুন্নি দুই প্রধান মুসলিম গোষ্ঠীর সাথে খ্রিস্টানধর্মের মানুষগণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে বসবাস করেন।

ভাষাগত বৈচিত্র্য

ভারত একটি বহুভাষিক রাষ্ট্র যেখানে ১৯০০-এর বেশি ভাষা ও উপভাষা প্রচলিত রয়েছে। সংবিধানের অষ্টম তফসিলে স্বীকৃত ভাষার সংখ্যা ২২টি, যার মধ্যে বাংলা, হিন্দি, উর্দু, তামিল, তেলেগু, কন্নড়, মালয়ালম, গুজরাটি, পাঞ্জাবি, মারাঠি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব ভাষা এবং উপভাষার প্রচলন রয়েছে, যা ভারতের ভাষাগত বহুত্ববাদকে আরও দৃঢ় করেছে। যদিও হিন্দি ও ইংরেজি কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মের প্রধান ভাষা, তবে আঞ্চলিক ভাষাগুলোর গুরুত্বও সমানভাবে স্বীকৃত। ভারতীয় সমাজে দ্বিভাষিকতা ও বহুভাষিকতার প্রচলন অত্যন্ত সাধারণ, যা জাতীয় সংহতি ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনকে আরও শক্তিশালী করে।

ধর্মীয় বহুত্ববাদ

ভারত বহুধর্মীয় সমাজের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও ইহুদি সম্প্রদায়ের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছে। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ

সংবিধান সকল ধর্মের প্রতি সমান মর্যাদা প্রদান করে এবং প্রত্যেক নাগরিককে তার ধর্মাচরণ, প্রচার ও প্রসারের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। হিন্দুধর্ম ভারতের প্রধান ধর্ম হলেও ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম, শিখধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি দেশটির ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। প্রতিটি ধর্মের নিজস্ব উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে, যা ভারতীয় সমাজের সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদকে ফুটিয়ে তোলে। যেমন, হিন্দুদের দীপাবলি ও দুর্গাপূজা, মুসলমানদের ঈদ, খ্রিস্টানদের বড়দিন, শিখদের গুরুপরব, বৌদ্ধদের বুদ্ধপূর্ণিমা এবং জৈনদের মহাবীর জয়ন্তী সমগ্র দেশে সমান উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয়।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

ভারতীয় সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। জাতিগত ও সামাজিক স্তরের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একধরনের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নিজস্ব নৃত্য, সংগীত, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক ও শিল্পকলা রয়েছে। যেমন, উত্তর ভারতে কথাক নৃত্য, দক্ষিণ ভারতে ভরতনাট্যম, পূর্ব ভারতে সাত্রিয়া ও পশ্চিম ভারতে কাথাকালি নৃত্যের জনপ্রিয়তা রয়েছে। একইভাবে, ভারতের খাদ্য সংস্কৃতিতেও বৈচিত্র্যের ছাপ স্পষ্টবাংলার রসগোল্লা, পাঞ্জাবের মক্কি কি রোটি-সরসো দা সাগ, দক্ষিণ ভারতের ডোসা-সাম্বর এবং মহারাষ্ট্রের বেলপুরি প্রতিটি অঞ্চলের স্বতন্ত্র স্বাদ ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরে।

অর্থনৈতিক বহুত্ববাদ

ভারতের অর্থনীতি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়, যেখানে কৃষি, শিল্প, পরিষেবা খাত এবং তথ্যপ্রযুক্তি একসঙ্গে উন্নয়নের অংশীদার। গ্রামীণ ভারতের কৃষিনির্ভর অর্থনীতি যেমন দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, তেমনই শহরভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি ও শিল্প খাত দেশের আর্থিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করছে। ভারতীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হলো এতে বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানির পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, হস্তশিল্প, কুটির শিল্প এবং স্থানীয় ব্যবসার সমান সুযোগ রয়েছে।

জাতিগত ও সম্প্রদায়ভিত্তিক বৈচিত্র্য

ভারতে শতাধিক জাতিগোষ্ঠী এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাস রয়েছে, যারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা বজায় রেখেছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগাল, মিজো, মণিপুরি ও অসমীয়া জনগোষ্ঠী থেকে শুরু করে মধ্য ভারতের সাঁওতাল, মুন্ডা, গোঁড, ভূমিজ ও ওঁরাও আদিবাসীদের আলাদা পরিচয় রয়েছে। প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষা, ধর্মীয় রীতি, খাদ্যাভ্যাস এবং সামাজিক কাঠামো বিদ্যমান, যা ভারতের বহুত্ববাদী সমাজব্যবস্থাকে আরও গভীরতা দিয়েছে।

১৩.৪ সারসংক্ষেপ

ভারতের বহুত্ববাদী সমাজ ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি। মানবজাতির যত বিশ্বাস আছে, সবই

ভারতবর্ষে পাওয়া যাবে। ভারতীয় জাতীয়তা একটি ধারনার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, যেটা হল ভারত একটি চিরস্থায়ী ভূমি, যার উৎপত্তি প্রাচীন সভ্যতা, যার অভিন্ন ইতিহাস ঢিকে আছে বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের জোরে। ভারতবর্ষ বহুত্ববাদী সমাজের এক উজ্জ্বল উদাহরণ, যেখানে ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সামাজিক গোষ্ঠীর বিপুল বৈচিত্র্য বিদ্যমান। 'Unity in Diversity' বা 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' ভারতীয় সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এখানে একাধিক ভাষার প্রচলন, ধর্মীয় বিশ্বাসের সহাবস্থান, জাতিগত ও সামাজিক বিভাজনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পার্থক্য বিদ্যমান।

বহুত্ববাদী সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো এতে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মানুষ নিজস্ব সংস্কৃতি ও পরিচয় বজায় রেখেও একত্রে বসবাস করতে পারে। ভারতীয় সংবিধানও এই বহুত্ববাদকে স্বীকৃতি দিয়ে নাগরিকদের সমানাধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে।

ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্য ১৯০০-এর বেশি ভাষা ও উপভাষার উপস্থিতি দ্বারা চিহ্নিত। ধর্মীয় বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও ইহুদি সম্প্রদায়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ভারতকে আরও সমৃদ্ধ করেছে, যেখানে বিভিন্ন প্রদেশের নিজস্ব রীতিনীতি, খাদ্যাভ্যাস ও জীবনধারা রয়েছে।

অর্থনৈতিক বহুত্ববাদ ভারতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যেখানে কৃষি, শিল্প, পরিষেবা খাত, তথ্যপ্রযুক্তি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প একসাথে সমৃদ্ধি লাভ করছে।

এই অধ্যায়ে ভারতের বহুত্ববাদী সমাজের সুবিধা ও চ্যালেঞ্জ উভয় দিক আলোচনা করা হয়েছে। যদিও বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় বিভাজন মাঝে মাঝে সংঘাত সৃষ্টি করে, তবে ভারতের মূল চরিত্র এই বহুত্ববাদ ও সহনশীলতার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।

১৩.৫ স্বমূল্যায়ন প্রশ্নাবলী

১। ভারতীয় সমাজ কিভাবে বহুত্ববাদী সমাজ?

২। ভারতবর্ষে কত ধরনের সম্প্রদায় আছে।

৩। বহুত্ববাদ বলতে কী বোঝায়?

৪। ভারতের সমাজ কাঠামোকে বহুত্ববাদী বলা হয় কেন?

৫। ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬। ধর্মীয় বহুত্ববাদ কীভাবে ভারতীয় সমাজকে প্রভাবিত করেছে?

৭। ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের কিছু উদাহরণ দিন।

৮। অর্থনৈতিক বহুত্ববাদ বলতে কী বোঝানো হয়?

৯। বহুত্ববাদী সমাজের সুবিধা ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১০। ভারতের সংবিধান কীভাবে বহুত্ববাদকে সমর্থন করে?

১১। স্মিথ ও ডাল-এর বহুত্ববাদ সংক্রান্ত মতবাদ কী?

১২। 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' ধারণাটি ভারতের ক্ষেত্রে কীভাবে প্রযোজ্য?

১৩.৬ অভিসম্বন্ধ (Reference)

Agarwal, J. C (2002) Theory and Principles of Education (13th ed.) New Delhi; Vikash Publishing House.

Bhatia, K & Bhatia, B. D (1992) Theory and Principles of Education (20th Ed.) Delhi; Doaba House.

Bhattacharya, D. C (1996). Sociology (6th ed.) Cacutta Vijoya Publishing House.

Pandey, R.S (2009). Principals of Education (13th Ed.) Agra-2, Agrawal Publications.

Ravi, S. S (2015) A comprehensive study of Education (2nd Ed.) Delhi; PHI Learning Sharma, Y. K. (2016) Foundation in Sociology of Education, Delhi; Kaniska Publishers.

Saxena, N.R.S (2009) Principles of Education Meerut; Vinay Rakhija.

অধ্যায় ১৪ ❑ সামাজিক বৈচিত্র্য এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি (Social Diversity and Inclusion)

গঠন

১৪.১ উদ্দেশ্য

১৪.২ ভূমিকা

১৪.২ সামাজিক বৈচিত্র্যতা

১৪.৩ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বৈচিত্র্যতা

১৪.৪ সামাজিক অন্তভূক্তিকরণ

১৪.৫ সামাজিক অন্তভূক্তির বিভিন্ন ধরন

১৪.৬ সারসংক্ষেপ

১৪.৭ স্বমূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

১৪.৮ অভিসম্বন্ধ

১৪.১ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর ছাত্র-ছাত্রীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করবে—

- সামাজিক বৈচিত্র্যতা বলতে কি বোঝায়
- সামাজিক বৈচিত্র্যতার বিভিন্ন ধরন গুলি কি কি
- সামাজিক অন্তভূক্তিকরণ বলতে কি বোঝায়
- সামাজিক অন্তর্ভুক্তির বিভিন্ন ধরন গুলি কি কি

১৪.২ ভূমিকা

বহুত্ব বিশিষ্ট সমাজ ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট A.C. Smith বলেছেন 'Unity in Diversity' বিভিন্ন কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন, বহুধর্ম ও বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষগণ ভারতের অখণ্ড রূপকে তুলে ধরেছেন। সামাজিক বৈচিত্র্য বলতে ধর্ম, সাংস্কৃতিক পটভূমি, সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সমাজে দেখা পারথক্যকে বোঝায়। প্রাচীনকাল থেকে উৎকর্ষ দেশ হিসাবে বিভিন্ন জাতির

সমাগম ভারতবর্ষকে সামাজিক বৈচিত্র্যতার সাজিয়ে তুলেছে। আবার এই সমাজই নিজেকে গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ আখ্যা দিয়ে সব বৈচিত্র্যকেই নিজের বুকে স্থান দিয়ে সামাজিক অন্তর্ভূক্তিকরণের পথকে প্রশস্ত করেছে। ভারতীয় সংবিধান তার প্রতিটি ছত্রে সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে দেখেছে। শিক্ষাকে প্রধান হাতিয়ার হিসাবে পরিগনিত করে বৈচিত্র্যের মধ্যে সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ও তার সমাজ বহুলাংশে সফল।

১৪.২ সামাজিক বৈচিত্র্যতা

সামাজিক বৈচিত্র্যতা এমন একটি ধারণা যা সমাজে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, এবং জীবনধারার সহাবস্থানকে নির্দেশ করে। এটি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহিষ্ণুতা, এবং ঐক্যের ধারণা গড়ে তোলে। বৈচিত্র্য একটি সমাজকে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, এবং রাজনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করে, কারণ বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিন্নমুখী চিন্তাভাবনা এবং অভিজ্ঞতা সমাজের অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখে। ভারতের মতো দেশে সামাজিক বৈচিত্র্যতা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি বিশ্বের অন্যতম বৈচিত্র্যময় দেশ। এখানে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধসহ বহু ধর্মের অনুসারীরা বসবাস করেন, এবং প্রতিটি ধর্মের নিজস্ব রীতিনীতি, উৎসব এবং ঐতিহ্য রয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ, যেমন হিন্দি, বাংলা, তামিল, তেলেগু, এবং আরও অনেক ভাষার উপস্থিতি সমাজকে ভাষাগত বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করেছে। সামাজিক বৈচিত্র্যতা শুধুমাত্র সমাজের বহুমুখী প্রকৃতির প্রতিফলন নয়, এটি একটি উদার, সহিষ্ণু এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের ভিত্তি। তবে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বৈচিত্র্যের ভুল ব্যবস্থাপনা সংঘাত এবং বিভাজন সৃষ্টি করতে পারে। তাই, সামাজিক বৈচিত্র্যকে একটি শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে, এটি সংরক্ষণ এবং উন্নীত করার মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

১৪.৩ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বৈচিত্র্যতা

মূলতঃ জাতিগত, ধর্মীয় ও ভাষাগত পার্থক্যের উপর ভিত্তি করেই সামাজিক বৈচিত্র্য পরিবর্তত হয়। সরোকিমের মতে সামাজিক পার্থক্য মূলতঃ দুই ধরনের, যথা আন্তঃগ্রুপ পার্থক্য এবং অন্তরগ্রুপ পার্থক্য। তাছাড়া সমাজিক পার্থক্য নিরুপন হয় যথাক্রমে ইউনিবাউন্ড গ্রুপ যেখানে একটি গ্রুপের সদস্যরা জাতি, সেক্স বা ধর্মের ভিত্তিতে একত্রিত হয়। তাছাড়া মাল্টি বাউন্ড যেখানে কয়েকটি ইউনিবাউন্ড গ্রুপ কতকগুলি মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে একত্রিত হয়, যেমনকাস্ট, শ্রেণী ও উপজাতি। বিভিন্ন অন্তঃ শ্রেনীকে যখন উচ্চতর বা নিম্নতর এইভাবে নির্দেশিত করা হয় তখন তা অন্তরগ্রুপ বিভাজনের জন্ম দেয়, যেমন ভারতীয় শ্রেনী ব্যবস্থা।

ভাষা: ভাষা হচ্ছে অন্যতম ঐক্যবদ্ধতার নিদর্শন। অন্য যেকোনো সামাজিক সূচকের থেকে ভাষা অনেক বেশী শক্তিশালী সূচক। কোনো এক সামাজিক গ্রুপের পরিচয় আরও বেশী শক্তিশালী হয়ে ওঠে

যখন সেই গ্রুপের সদস্যরা সকলেই একই ভাষায় কথা বলেন। ভারতবর্ষে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলি পুনর্গঠন ভাবা হলেও ভাষাগুলিও সমস্যা সম্পূর্ণরূপে দূর করা যায়নি। ভাষা ভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের সময় অল্প কিছু ভাষাকেই সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ শুধু আঞ্চলিক স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে। তিন ভাষা সূত্র সব রাজ্য একইরকমভাবে অনুসরণ করেনি। এছাড়া সংখ্যালঘুভাষার মানুষদের শিক্ষানীতি, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও কোন রাজ্য করেনি। জাতীয়স্তরে সংঘবদ্ধতার জন্য, ভাষাগত দিকটাও নীতি-নির্ধারক কাঠামোর মধ্যে রাখতে হবে। ভারতীয় সংবিধান ১৫টি ভাষাকে প্রধান ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রত্যেক প্রধান ভাষার আঞ্চলিক ও দ্বান্দ্বিক পার্থক্য রয়েছে। এছাড়াও প্রায় ২২৭ ভাষা ও উপভাষা রয়েছে যা ভাষাগত ঐক্যবদ্ধতার অন্তরায়। এছাড়া উপলব্ধি ভাষাগত পার্থক্য পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে ভুগেছে।

ধর্ম: সামাজিক বন্ধন ও ঐক্যের জন্য ধর্ম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধর্ম বলতে সাধারণতঃ আমরা কোনো অতিপ্রাকৃতিক বিষয়ের উপর বিশ্বাসকে বোঝায়। ভারতীয় সভ্যতার আদিপর্ব থেকেই ধর্মকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ভারতবর্ষ বহুধর্ম ভিত্তিক এক দেশ। ধর্ম সংস্কার আন্দোলন ভারতের সাংস্কৃতিক জগতের এক ভাষাঙ্গীক অংশ। ১৯৬১ সালে জনগননা অনুযায়ী মোট ৭টি ধর্ম যথা হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ এবং অন্যান্য এই ৭টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এছাড়া ইহুদী, পার্শী ও উপজাতি ধর্মের কথা বলা হয়েছে। রক্ষণশীলতা ও প্রণতি এই দুই বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ধর্মের পার্থক্যকে তুলে ধরেছে। ধর্মান্তকরণ ভারতীয় সমাজে এক বিতর্কিত বিষয়। বর্তমানেও এই সমস্যা বিদ্যমান, বিশেষতঃ আদিবাসী সমাজে ধর্মান্তকরণ বিষয়টি বর্তমানে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং কখনও কখনও সংঘর্ষের সূচনা করছে। অপরদিকে ধর্ম কোনো গ্রুপের আভ্যন্তরীণ শ্রেণী, ভাষা ও অন্যান্য পার্থক্যকে দূরে সরিয়ে সকলকে ঐক্যের সূত্রে গাঁথে। এমনকি বাইরের থেকে আগত ধর্মগুলি যেমন ইসলাম, ইহুদী, পার্শী প্রভৃতি ধর্ম ক্রমশ ভারতীয় চরিত্র লাভ করেছে। হিন্দুধর্ম প্রধান ধর্ম হলেও অনান্যে ধর্ম একই সাথে পাশাপাশি তৈরী হয়েছে। ভক্তি ও সুফি আন্দোলন ধর্মীয় আদান প্রদানের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভারতীয় সংবিধান সব ধর্মের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ভারতবর্ষকে এক ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে ঘোষণা করেছে। শুধু তাই নয় সব ধর্মের মানুষের এখানে নিজ ধর্ম পালনের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। জাতীয় নীতি ব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থায় একই ধর্ম নিরপেক্ষতার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়।

জাতি ব্যবস্থা: জাত বা কাস্ট হচ্ছে এমন এক ব্যবস্থা সামাজিক সম্পর্ককে নির্ধারণ করে। ইহা ভারতীয় সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা এন্ডোগামী, বংশানুক্রম পেশাগত দিক, শুদ্ধতাও অশুদ্ধতা ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে। ইহা ভারতীয় সমাজের আভ্যন্তরীণ ভিত্তি এবং সামাজিক ভিত্তি বা ধর্মীয় অনুশাসনের বেড়াজালকে অতিক্রম করে গেছে। চতুাবর্ণাশ্রম ব্যবস্থা বিভিন্ন শ্রেনী সমন্বয়ে জাতি প্রথার উৎপত্তি ঘটিয়েছে। কাস্ট বংশানুক্রমিক এক ব্যবস্থা বংশানুক্রমিক হলেও জাত ব্যবস্থা কখনই স্থবির নয়। হাজার ধরনের গোষ্ঠী, উপগোষ্ঠী, উপঙ্গত কাস্টসিস্টেমের পরিবর্তন ঘটাতে সামাজিক বৈষম্যকে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য

করেছে। কিছু সমাজ বিজ্ঞানী মনে করেন সামাজিক বিভাজকের দুটে ভিন্ন ধরন হলো কাস্ট এবং ক্লাস, কাস্টের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্লাস তৈরী হয়। যতই রূপান্তর বা পরিবর্তন থেকে কাস্ট সিস্টেম আজও ভারতীয় সমাজে আদর্শের মতো বহমান। কাস্ট সিস্টেমের মধ্যেই লুকিয়ে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার উপাখ্যান। ভারতীয় সংবিধান শোষিত অনুশাচিত জাতি (SC) ও অনুশুচিত উপজাতি (ST) গুলিকে রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত বিধান দিয়েছে।

উপজাতি: ভারতীয় উপজাতিগণ আমাদের সমাজ সংস্কৃতিতে এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে মোট জনসংখ্যার ৪ শতাংশ উপজাতি। ভারতবর্ষে উপজাতি শব্দের অভিধানিক অর্থ খুজে বের করা কঠিন। ইম্পেরিয়াল গেজেট অনুসারে উপজাতি তারাই শব্দের কখন নাম, কখন উপভাষা আছে, যারা এক এক জায়গায় বাস করে এবং অবশ্যই এন্ডোগমাস। উপজাতি বর্গের উপর সেইভাবে আজও গবেষণা হয়নি। কিছু জনের মতে ভারতবর্ষে ট্রাইব বা উপজাতি শব্দটি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তৈরী হয়েছে। এই উপজাতিগণকে রাজ্য অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে ফলে এমনও হয়েছে যে একটি রাজ্যে একদল উপজাতি অনুসুচিত উপজাতির (ST) মর্যাদা পেলেও অন্য রাজ্যে তারা তা পায়নি। এই উপজাতিগণ সাধারণ ভারতীয়দের থেকে পড়াশোনায় শত যোজন পিছিয়ে আছে। তাদের অনন্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনান্য পিছিয়ে পড়া অনেক গোষ্ঠী থেকে তাদের আলাদা করেছে। এই উপজাতিগণের মধ্যে কোন কোন দল আজও আধুনিক সভ্যতার থেকে বহুদূরে সভ্য সমাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে অবস্থান করছে। যেমন আন্দামানের জারোয়ারা আভার একদল আধুনিকতায় নিজেদের সজ্জিত করেছে, যেমন রাজস্থানের মীনারা। এইসকল উপজাতি গণের মধ্যে ভাষাগত, বিবাহ বংশানুক্রম সাংস্কৃতিক, অবস্থানগত, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক পার্থক্য সুস্পষ্টভবে বিদ্যমান। উপজাতিদের মধ্যে জাতীয় থেকে আধুনিকতার প্রভাব অনেক বেশী আর তাই উপজাতিদের সমস্যাগুলি স্থানগত, রাজ্যগত এবং বিভিন্ন উপজাতি অনুসারে বিভিন্ন ধরনের।

লিঙ্গ: লিঙ্গ পুরুষ ও নারীর মধ্যে জৈব সামাজিক পার্থক্য নিরুপণ করে। লিঙ্গগত বৈষম্য হচ্ছে সমাজের সৃষ্টি যা বিভিন্ন বিপরীত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর এবং ইহাকে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ এই দুইভাগে বিভক্ত করেছে। লিঙ্গ বৈষম্য আসলে জৈব সামাজিক বৈষম্য যা সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সমাজে প্রোথিত রয়েছে এবং সামাজিক সংগঠন রূপে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা ও তার নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টি লুকিয়ে রয়েছে। এই লিঙ্গ বৈষম্য এক সামাজিক গ্রুপ থেকে অন্য সমাজিক গ্রুপে ভিন্ন রূপে বর্তমান। ভারতবর্ষে শিক্ষার মানোন্নয়ণের সাথে সাথেই লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টি আরও প্রকট এবং গভীরতর হয়েছে। ২০০১ সালের জনগননা অনুসারে যেখানে পুরষ শিক্ষিতের হার ৭৫.৮৫ শতাংশ সেখানে স্ত্রীশিক্ষিতের হার মাত্র ৫৪.১৬ শতাংশ। শিক্ষার প্রতি স্তরেই লিঙ্গ বৈষম্য বর্তমান। উদাহরস্বরূপ বলা যায় প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মধ্যে ২২ শতাংশ ফাঁক বর্তমান। লিঙ্গর ক্ষেত্রে লিঙ্গগত বৈষম্যের মূল কারণ ভারতীয় নারীদের সমাজে পশ্চাদপদ অবস্থা। যদিও ভারতীয় সমাজে

নারীদের প্রতিক্ষেত্রেই পুরুষশাসিত সমাজের দ্বারা শোসিত হতে হয় তবে ইহা এক সামাজিক গ্রুপ থেকে অন্য সামাজিক গ্রুপে ভিন্নধর্মী। লিঙ্গবৈষম্য তীব্রতর হয় যখন এর সাথে শ্রেণী, কাস্ট, ধর্ম ও অন্যান্য বিভাজনমূলক বিভাগগুলি যুক্ত হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষায় স্কুল ছুটের থর উপজাতি মেয়েদের মধ্যে সবথেকে বেশী। একটি গ্রুপের বৈষম্য ক্রমে আঞ্চলিক বৈষম্যে পরিণত হতেপারে যদি ঐ বিশেষ গ্রুপেরসদস্য সংখ্যা ঐ অঞ্চলে সবথেকে বেশী হয়। তাই অঞ্চল অনুসারে আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্যের তারতম্য পরিলক্ষিত হয় যদিও অঞ্চল কোনো সামাজিক শ্রেণীবিভাগ নয়। যেমন উত্তরাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল আর্থিক ও শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে কারণ এই অঞ্চলে সবথেকে বশী পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর লোক বাস করেন। বিভিন্ন গ্রুপের অন্তর বৈষম্য ও আন্তঃ বৈষম্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। নিম্নলিখিত অধ্যয়ে শিক্ষার উপর সামাজিক বৈচিত্র্যের প্রভাব আলোচনা করা হল।

বিকালাঙ্গতা বা অক্ষমতা: জনবিভাজনের আরেকটি বিভাজক হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অক্ষমতা যেমন—শারীরিক, মানসিক এবং পরিস্থিতিজনিত। আমাদের এই বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের তাদের সক্ষমতা অনুসারে সমাজে স্থান করে দিতে হবে।

এছাড়াও আরোও বহু ধরনের সমাজ বিভাজক আছে যেমন বাসস্থানের ধরণ বিবাহ, শহর বা গ্রাম বংশানুক্রম ইত্যাদি। এইভাবে পুরো ভারতীয় উপমহাদেশেই বিভিন্ন ধরনের বিভাজন রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বিভাজন কখনই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য নয় বরং সবরকম বিভাজনকে আত্তীকরণ করে ভারতীয় সংস্কৃতি ঐক্যবদ্ধতার বার্তা দেয়।

১৪.৪ সামাজিক অন্তভূক্তিকরণ

প্রত্যেক দেশেই বেশ কিছু সামাজিক গ্রুপকে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া হয়। শুধুই আইন করে নয়; ব্যবহার বিশ্বাস ও ধারনার উপর ভিত্তি করে এই বাধন সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া সামাজিক অনগ্রসরতা লিঙ্গ, বয়স, অবস্থান, কর্মস্থান, ধর্ম, নাগরিকত্ব, অক্ষমতা ও লিঙ্গ প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

সামাজিক বর্জন ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, চাহিদা ও সুবিধাপ্রাপ্তি থেকে মানুষকে চরমভাবে বঞ্চিত করে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে জাতিপুঞ্জ দাবি তুলেছে 'No one leave behind' যা বিভিন্ন দেশকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ণের মাধ্যমে সুস্থায়ী উন্নয়ণের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে। সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ এর এক আঙ্গাঙ্গিক অংশ।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক সামাজিক অন্তর্ভুক্তির সংজ্ঞায় বলেছে—

১। এটি এমন এক পদ্ধতি যা ব্যক্তি ও গ্রুপের সামাজিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করে।

২। এমন এক প্রক্রিয়া যা পশ্চাদপদ গোষ্ঠীর ক্ষমতায়ণ সুযোগবৃদ্ধি ও সম্মান জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে তাদের সামাজিক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করে।

সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ এমন এক সমাজকে বোঝায় যা সব বৈষম্য দূরে সরিয়ে রেখে সকলের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে গণতন্ত্রের উন্নয়ণ এবং পুঁজিবাদের বিবর্তনের সাথে সাথেই সামাজিক অন্তর্ভূক্তিকরণ বিষয়টি গতি লাভ করে। এটা খুবই বৈপীরত্যমূলক সামাজিক বৈশিষ্ট্য কারণ সমাজে রাজনৈতিক সংগঠনগুলি সমাজ বিভাজনের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠেছে এবং শাসক রাজনৈতিক সংগঠন এই সমাজে বিভাজককে ভিত্তি করেই তাদের কাজ চালায়। অপর দিকে যুগে যুগে নতুন নীতি ও পথের মাধ্যমে সামাজিক অন্তর্ভুকরণ এর প্রচেষ্টা হয়েছে। এই অন্তর্ভুক্তিকরণ হয়েছে প্রয়োজন।

সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, সামাজিক অঙ্গীভূত বা আত্তীকরণের সবথেকে ভালো উদাহরণ হলো ভারতীয় সমাজ যা যুগযুগ ধরে সামাজিক অন্তর্ভূক্তি ও আত্তীকরণের মাধ্যমে বহুজাতিকে গ্রহণ করেছে। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত বিভিন্ন উপজাতি যেমন শক ও হুনদের ভারতীয় সমাজ গ্রহণ করেছে। নতুন নতুন শর্ত ও শব্দ প্রণয়ণ করা হয়েছে এদের সমাজে অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে। ‘ম্লেচ্ছ’ শব্দটি শুধুমাত্র বিদেশীদের প্রণয়ণ হয়নি একইসাথে ভারতীয়দের সাথে এই বিদেশীদের সামাজিক সম্পূর্ণ নির্ধারণ করতো এই শব্দ। মধ্যযুগের ইতিহাসও এই ধরনের বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপের অন্তর্ভুক্তিকরণের সাক্ষী। উনিশি শতকের ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্যস্বরূপ স্থবিরতা ও অপরিবর্তনশীলতাকে তুলে ধরে ছিলেন। অপরিবর্তনশীল গ্রামীণ ভারতীয় সমাজ ও তার স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জাত ও ধর্ম বিভিন্ন ইউরোপীয় মতবাদ মূলতঃ এই ধারণায় উপর ভিত্তি করেই তৈরী হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব চিত্র ছিলো অন্য। বিভিন্ন সামাগ্রিক সংগঠন ও গ্রুপের মধ্যে আদান প্রদান ছিলো যা ছড়িয়ে পড়েছিলো দেশ থেকে দেশান্তরে। তীর্থক্ষেত্র ছিলো এর এক প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ বহু জাতি, তাদের চিন্তা ও ভাবনার সম্বন্বয় সাধন এই সরলরৈখিক অন্তর্ভূক্তিকরণ উর্দমুখী প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বেশীরভাগ ঘটেছিলো। উপনিবেশিক ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিকগণ ও বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্যে অন্যান্য, বিভিন্ন উপায়ে সম্পদ শোষণ দুই সমাজকে দুইমেরুতে অবস্থান করিয়েছিলো।

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা, শাসিক ও শাসিত এই দুই এর মধ্যের অসাম্যকে জাতি, প্রযুক্তি ও সভ্যকরণ এর দোহাই দিয়ে আইনি স্বীকৃতি প্রদান করেছিলো। ঔপনিবেশকারীদের সমাজ ও উপনিবেশ এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য ছিলো, সম্পদের মালিকানায় বৈষম্য যা ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্রের মতে ‘ঔপনিবেশিক উৎপাদন ব্যবস্থা’। ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রাক উপনিবেশিক যুগেও সামাজিক অসাম্য ছিলো। ঐতিহাসিক ইরফাণ থাকিব দেখিয়েছেন যে মুঘল ভারতে গবীর মানুষের অবস্থা ছিলো সত্যিই সঙ্গীন। এই সামাজিক অসাম্য ও তার বৈশিষ্ট্য আগে ভালোভাবে জানা প্রয়োজন এবং তারপরেই কিভাবে তা দূরীকরণ সম্ভব তা নিয়ে ভাবতে হবে।

১৪.৫ সামাজিক অন্তভূক্তির বিভিন্ন ধরন

যেহেতু আমরা সামাজিক বর্জনের ভিত্তি ও উপায়গুলো জানি তাই সামাজিক অন্তর্ভূক্তিকরণের নীতিগুলো আমরা বুঝতে পারি। বলাবাহুল্য চিরকালই এই সামাজিক অন্তভুক্তিকরণের জন্য নানা আন্দোলন রয়েছে যা বহুমুখী সমাজে এই অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। তবে জাতির ভিত্তিতে বিভাজিত এই সমাজে অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়া বেশ জটিল। প্রথমেই সমাজে সেই বিশেষ শ্রেনীর অবস্থান জানা প্রয়োজন। এন. কে. বোস ১৯৪১ সালে তার গবেষণার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছিলেন কিভাবে হিন্দু সমাজ বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীকে তাদের বিশেষ শিল্প দক্ষতার ভিত্তিতে হিন্দু সমাজ বিন্যাসে স্থান করে দিয়েছে। ঐতিহাসিকগণের মতে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন গোষ্ঠী কোনো একজাতির নাম প্রথা করে ধীরে ধীরে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজে ভঙ্গীভূত হয়েছে, অনেকের মতে ধর্মান্তকরণের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিবর্ণ নতুন সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে পড়লেও অনেকেই তাদের প্রাক্তন জাতির বিশ্বাস ও রীতিনীতি বজায় রেখেছে। সামাজিক ও জাতীয় কলেবর বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন নতুন গোষ্ঠী অঙ্গীভূত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উত্তর পূর্বের নানা, মণিপুরি, মিজেন প্রভৃতি উপজাতিগুলি ভারতীয় সমাজের মূলস্রোতে অঙ্গীভূত হয়েছে যদিও তারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোতে জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে কোনোটিই অবস্থান করেনি। উত্তরপূর্বের জাতিগত বৈচিত্র্য নিঃসন্দেহে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় এক নতুন অঙ্গ ছিলো এবং যাকে অঙ্গীভূত করতে হবে। সামাজিক অন্তর্ভূক্তিকরণ ভারতের জাতি গঠনের অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য যা বিভিন্ন গোষ্ঠীকে এক অভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আঙিনায় এনেছে। ভারতীয় গণতন্ত্র এই অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়াকে এক বিশেষ রূপ দান করেছে।

অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক এবং পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতকে ভক্তি আন্দোলন সামাজিক বর্জন ও সংরক্ষণশীলতাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলো। দক্ষিণ ভারতের ভীরশৈবা আন্দোলন এবং নানক, কবীর, রবিদাস প্রমুখ ভক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ববর সামাজিক বর্জনের তীব্র সমালোচনা করেন এবং এক নতুন উদারবাদী চিন্তার প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে সুফী আন্দোলনও ইসলামের গন্ডী ছাড়িয়ে সবধর্ম সম্বন্বয়ের আদর্শ, মানবতাবাদের আদর্শ তুলে ধরে।

ধর্মীয় সংস্কার এর সাথে সামাজিক সংস্কারের সুগভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। আর তাই উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের নায়কেরা ধর্মীয়রীতি নীতি, অনুশীলতা ও সামাজিক বৈষম্যকে তীব্রভাগে আক্রমণ করেন। উনিশ শতকের গোড়ার থেকেই রাজা রামমোহন রায়, জ্যোতিবা ফুলে, শ্রী নারায়ণ গুরু, দয়ানন্দ সরস্বতী, দাদাভাই নৌরজী প্রমুখ সমাজ সংস্কারগণ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের তাগিদ অনুভব করেছিলেন, তারা প্রচলিত জাতপাত, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। রাজা রামমোহন রায় মনে করতেন এই ধরনের বিভাজন থেকে যে কোনো সমাজের উন্নতির অন্তরায়। পরবর্তীকালে এম. জি. রানাডে, এন. জি. চন্দ্রভাকর প্রমুখ সমাজ সংস্কারকগণ সংস্কার আন্দোলনকে সমাজের মূলস্রোতে নিয়ে আসেন।

ইতিমধ্যে ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সংস্কারের কাজ করতে থাকেন। যেমন জ্যোতিবা ফুলে মেয়েদের জন্য স্কুল খোলেন এবং সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিলো সবথেকে বড়ো গণ আন্দোলন। এই গণ আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্যছিলো উদরতা, গণতান্ত্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক, জাত ধর্ম, আঞ্চলিকতাকে দূরে সরিয়ে রেখে সর্বশ্রেণীর মানুষ এতে যোগদান করেছিলেন। মেননের মতে অসহাযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় এক বিরাট সংখ্যক নারী এই গণ আন্দোলনে যোগদান করে এবং এমনকি কারা বরণও করেন। এছাড়া কম্যুউনিস্ট ও সোসাল সিস্টেমের প্রচেষ্টায় কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী, প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষ করা বহু সংখ্যায় এই গণতান্ত্রিক গণ আন্দোলনে যোগদান করেন।

গান্ধীজীর আদর্শবাদ এই সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণের মধ্যে দিয়েই প্রোথিত হয়েছিল। সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষকে জাতীয়বাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিয়ে সবাইকে এক বৃহত্তর আঙিনায় নিয়ে আসা তার সর্বাধিক সাফল্য। তিনি অস্পৃশ্যতা ও হিন্দু মুসলিম বিভাজনকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ব্যধি হিসাবে উল্লেখ করেন এবং কখনোই এইসব বিভাজিকা শক্তির বিনিময়ে স্বাধীনতা চাননি। তিনি মনে করতেন যদি এই সকল সামাজিক ব্যাধি থেকে আমরা নিজেদের মুক্ত করতে না পারি তবে বিদেশী শক্তির নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন অর্থহীন হয়ে যাবে। জাতিপাত হীন এক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে গান্ধীজীর আপোষহীন লড়াই ইতিহাসে এক অনন্যস্থান অধিকার করে আছে। গান্ধিজী নিজেই এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন বিশেষ করে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে। উনিশো চব্বিশ-পঁচিশ এবং ১৯৩৪-৩৫ সালে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেন এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে জমিও গঠন করেন। উঁচুজাতের লোকেরা যাতে নিজের থেকে এগিয়ে এসে এই অস্পৃশ্যতার প্রথা বন্ধ করে সেই বিষয়ে গান্ধীজী জোর দিয়েছিলেন। বংশ পরম্পরা সুবিধা ভোগের মধ্যেই অস্পৃশ্যতা লুকিয়ে আছে বলে

গান্ধিজী মনে করতেন। বংশ পরম্পরাগত সুবিধা ভোগকে অবলুপ্তি ঘটিয়ে জাতপাত ও অস্পৃশ্যতা থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। তাই তিনি এই ধরনের অন্যান্য উদাহরণগুলোকে অস্পৃশ্যতা নামক ভয়ঙ্কর রোগের বহিলক্ষণ বলে মনে করতেন। গুরুভাশুর ও ভাইকম ‘মন্দির প্রবেশ’ আন্দোলন এই অস্পৃশ্যতা দুরীকরণের প্রাথমিক ধাপ হিসাবে মনে করা হয়।

গান্ধিজী চেয়েছিলেন যে সমস্ত উঁচুজাত অস্পৃস্যতাকে জন্ম ও প্রশ্রয় দিয়েছে তারা এই প্রথা বন্ধ করতে নিজের থেকেই এগিয়ে অমুক এবং ঐ অস্পৃশ্যতাদের সামাজিক সম্মান দিক। তাই তিনি চেয়েছিলেন নিচুজাতের, অস্পৃশ্য মানুষদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তি হোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কোনো অধিকারের ভিত্তিতে নয় কারণ তিনি জানতেন অন্তর থেকে স্বেচ্ছায় যদি সমাজ তাদের গ্রহণ না কার তবে কোনোদিনই লক্ষ্যপুরণ হবে না। গান্ধিজী হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিভাজন ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রধান অন্তরায় বলে মনে করতেন এবং এই বিভাজন ভুলে হিন্দু ও মুসলিমদের ঐক্য ও ভালোবাসার বন্ধনে তিনি আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। দাঙ্গা বিধস্ত নোয়াখালিতে তিনি হিন্দু রমণীদের মুসলিম রমণীদের

শিক্ষাদান করতে বলেছিলেন কারণ এর মধ্য দিয়ে তিনি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের পাঁচিল ভাঙতে চেয়েছিলেন। তিনি জিন্নার মধ্যে সমঝোতা করেছিলে কারণ তিনি মনে করতেন দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাজন আসলে একপ্রকার সামাজিক বাউন্ড।

দলিতদের খ্রীস্টানধর্মে ধর্মান্তকরণকে তিনি তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে এইভাবে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তিনি মনে করতেন এতে এক ধর্মের দ্বারা অপর ধর্মের অসম্মান হয়। বরং সেইসব ধর্মীয় রীতিনীতির সংশোধন করে সেইসব অত্যাচারিত মানুষদের ন্যায়বিচারের পক্ষে তিনি সওয়াল করেন। বাস্তবেই ধর্মান্তকরণ সামাজিক অন্তর্ভূক্তির পরিবর্তে এক নতুন ধরনের সামাজিক বর্জন ব্যবস্থা তৈরি করে। সামাজিক অন্তর্ভূক্তমূলক প্রক্রিয়া অবশ্যই কোনো হিংসা বা দাঙ্গা ছাড়াই সংগঠিত করতে হবে। নেলসন ম্যান্ডেলা গান্ধিজীর এই নীতিকেই বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রয়োণ করেছিলেন। মার্টিন লুথার কিং আমেরিকাতে কালো মানুষদের অধিকারের আন্দোলনে এই নীতির প্রয়োগ ঘটান।

১৪.৫.১ গণতান্ত্রিক অন্তর্ভূক্তিকরণ

গান্ধীজীর অনুসৃত সামাজিক অন্তর্ভূক্তিকরণ পদ্ধতি মূলতঃ অহিংসার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তিনি শ্রম ভিত্তিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপর জোর দিয়েছিলেন। অহিংস অন্তর্ভুক্তিকরণের সাথে গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তিকরণের এক সহাবস্থান লক্ষ্যনীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বগণও এইভাবেই অন্তর্ভুক্তির পক্ষে সওয়াল করেন। যেমন নেহেরু সোশালিস্ট মতবাদের উপর ভিত্তি করে এবং আম্বেদকার জাত-পাত ব্যবস্থা নির্মূল করে অন্তর্ভূক্তির পক্ষে সওয়াল করেন। গণতন্ত্র ও উন্নয়ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই কোনোরূপ হিংসা ছাড়াই এই সামাজিক উন্নয়ণ সম্ভব। ন্যায়বিচার এবং সমতা সমস্ত বিষয়ের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। উপরোক্ত কারণেই বিশ্বসংস্থাগুলিকে জাতি ও ধর্ম নিরপেক্ষ হওয়ার দাবী ওঠে। জাতহীন সমাজ এবং উপনিবেশ বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম ভারত জোরালো আওয়াজ তোলে। ঐতিহ্য এবং ঐতিহ্যবাদী সংগঠনগুলি যেমনগোষ্ঠী, জাতি ইত্যাদি সামাজিক অসাম্যের মূলভিত্তি। কারন এগুলি সামাজিক অসাম্যকে আইনের ভিত্তিতে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করে। আর এই অসাম্য দূরীকরণে শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সারা বিশ্বজুড়েই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলি সামাজিক অন্তর্ভুক্তির গুরু দ্বায়িত্ব পালন করে আসছে। স্বাধীন ভারতবর্ষেও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষানীতির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রায় ৪০ু ভারতীয় শিশু বিদ্যালয়ে যায় না। বেশ কিছু সংস্থার যেমন এম. ভি. ফাউন্ডেশন, সমীক্ষা অনুযায়ী দাবিদ্র নয় মূলতঃ প্রাপ্তনীতি এর জন্য দায়ী। তাই শিক্ষা আজও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির প্রধান মাধ্যম কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর শিশু এক অভিন্ন আঙিনায় এসে পড়ে সেখানে তাদের বিভিন্ন আধুনিক মতাদর্শ যেমন গণতন্ত্র, লিঙ্গ সমতা, ন্যায়বিচার সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করা হয় যা নতুন প্রজন্মের মধ্যে সামাজিক অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তাকে প্রোথিত করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে আম্বেদকার মনে করতেন হিন্দুধর্ম জাতপাত ও অস্পৃশ্যতাকে আইনি মানত্য দিয়েছে। আবার কমিউন্সিটদের মতে ধর্ম ভিত্তিতে গঠিত গোষ্ঠীতে লিঙ্গ বৈষম্য ও শ্রেণী শোষণ লুকিয়ে থাকে। উন্নয়ণের সাথে আধুনিকীকরণের

উপর তাই বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে যাতে নাগরিকত্ব ন্যায় বিচারের পাশাপাশি সামাজিক সমতার বিষয়টিও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রোথিত হয়।

১৪.৬ সারসংক্ষেপ

ভারতীয় সমাজ ও তার বিবিধ বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আমরা এই অধ্যায়ে অকাত হয়েছি। জেনেছি ও তার বিবিধ বৈচিত্র্যের প্রকারভেদ ও বৈচিত্র্যের উৎস সম্বন্ধে। সেইসাথে জেনেছি সামাজিক অন্তর্ভূক্তিকরণ কি এবং কিভাবে এই সামাজিক অন্তর্ভূক্তিকরণ ভারতীয় সমাজে সংগঠিত হয়ে আসছে।

১৪.৭ স্বমূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

১. ভারতীয় সমানে দুটি সামাজিক বৈচিত্র্যের উদাহরণ দাও।

২. লিঙ্গ বৈষম্য সম্বন্ধে তোমার মতামত কি?

৩. ভারতীয় সমাজে ভাষার ভূমিকা কি?

৪. ভারতীয় সমাজে ধর্ম কি ভূমিকা পালন করে?

৫. সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বলতে কি বোঝায়?

৬. গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তি বলতে কি বোঝায়?

১৪.৮ অভিসম্বন্ধ (Reference)

Agarwal, J. C (2002) Theory and Principles of Education (13th ed.) New Delhi; Vikash Publishing House.

Bhatia, K & Bhatia, B. D (1992) Theory and Principles of Education (20th Ed.) Delhi; Doaba House.

Bhattacharya, D. C (1996). Sociology (6th ed.) Cacutta Vijoya Publishing House.

Pandey, R.S (2009). Principals of Education (13th Ed.) Agra-2, Agrawal Publications.

Ravi, S. S (2015) A comprehensive study of Education (2nd Ed.) Delhi; PHI Learning Sharma, Y. K. (2016) Foundation in Sociology of Education, Delhi; Kaniska Publishers.

Saxena, N.R.S (2009) Principles of Education Meerut; Vinay Rakhija.

অধ্যায় ১৫ ❑ শিক্ষা ও সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা (Education and Contemporary Social Issues : Population Explosion, Unemployment, Poverty and Illiteracy)

গঠন

১৫.১ উদ্দেশ্য

১৫.২ ভূমিকা

১৫.৩ জনসংখ্যা বিস্ফোরণ

১৫.৪ বেকারত্ব

১৫.৫ দারিদ্র্যতা

১৫.৬ নিরক্ষরতা

১৫.৭ সারাংশ

১৫.৮ স্বমূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

১৫.৯ অভিসম্বন্ধ

১৫.১ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায় পাঠের পর ছাত্র-ছাত্রীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবগত হবেন।

- জনসংখ্যা বিস্ফোরণ বলতে কি বোঝার
- বেকারত্ব কি
- দারিদ্রতা কি
- নিরক্ষতার সামাজিক জীবনে কীভাবে সমস্যা হিসাবে পরিগনিত হয়

১৫.২ ভূমিকা

সমাজতাত্ত্বিকগণ সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা নিরুপণ করতে গিয়ে বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেন। টথখত্ন ছত্রনীব্ধত্বদ্ধ সামাজিক সমস্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘A social problem exists when organised society’s ability to order relationships among people seems to be failing, when its

institutions are fettering, its law are being flouted, the transmission of its values from one generation to the next is breaking down, the framework of expectations is being shaken' ভারতবর্ষ উন্নয়নশীল দেশ, তৃতীর বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে পরিগনিত হয়। অর্থনৈতিক ভাবে অনগ্রসরতা ভারতের সব থেকে বড় সমস্যা। এই সমস্যা থেকে সামাজিক সমস্যাগুলি উদ্ভুত হয়েছে। বর্তমান সময়ে ভারতীয় সমাজ যে সমস্যাগুলির রাহুপাশে আবৃত সেগুলি হল— জনবিস্ফোরণ, বেকারত্ব, দারিদ্রতা, নিরক্ষতা।

১৫.৩ জনসংখ্যা বিস্ফোরণ

সত্তরের দশকের মধ্যভাগ থেকেই শিক্ষা ও জনসংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক নিরুপণে গবেষকদের মধ্যে উৎসাহ দেখা দেয়। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর জনসংখ্যা পূর্বের ১০,০০০ বছরের থেকে ৫০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধুমাত্র অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীতে জনসংখ্যা ৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই জনবিস্ফোরণ পরিবেশ ও মানব উন্নয়ণে কতখানি প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত। বহু বিশেষজ্ঞ ও নীতি প্রণয়ণকারীর মতে শিক্ষার প্রসার এই জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে এক সীমিত স্তরে বেঁধে রাখতে সক্ষম। তাই তারা মনে করেন লিঙ্গ লাভের সুযোগ বৃদ্ধি বিশেষতঃ নারীদের জনসংখ্যার চাপ কমাতে সহায়ক হবে। আগামীতে নীতি প্রণয়ণকারীগণের কাছে বিতর্কের বিষয় কিভাবে শিক্ষালাভ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে জনবিস্ফোরণের প্রধান কারণ ছিলো মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে যাওয়া। এই সময় শিশু মৃত্যুর হারপ্রতি তিনজনে একজনের মৃত্যু থেকে কমে প্রতি একশো জনে একজন হয় উন্নত দেশগুলিতে এবং প্রতি দশজনে একজন হয় উন্নয়ণশীল দেশগুলিতে। সম্পদশালী দেশগুলিতে জন্মহার এমনভাবে স্থিতিশীল করা হয়েছিলো যাতে জন্মহার ও মৃত্যুহারের মধ্যে এক সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয় এবং এর ফলে ঐ সব দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এক শতাংশের নীচে নেমে যায়। অর্থনৈতিকভাবে বিওসালী দেশগুলিতে মহিলাদের তাদের সমগ্র প্রজননক্ষম সময়ে সন্তান উৎপাদনের হার গড়ে সাতটি বাচ্চা থেকে দুয়ের কম হয়। কিন্তু এর বিপরীত চিত্র দেখা যায় গবীর দেশগুলিতে সেখানে মৃত্যুহার দ্রুত কমলেও জন্মহার তার সাথে তাল মিলিয়ে কমেনি। যার ফলশ্রুতি স্বরূপ জন্মহার, মৃত্যুহারের থেকে অনেক বেশী হওয়ায় সারা পৃথিবী জন বিস্ফোরণের সম্মুখীন হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, যে সমস্ত দেশগুলিতে সামাজিক ও শিক্ষাখাতে খুব কম ব্যয় করা হয় সেইসব গরীব দেশগুলিতে জনসংখ্যা সব থেকে বেশী। উপরোক্ত কারণ দূরীকরণ কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার কারণে ধনী ও গরীবের মধ্যে ফারাক ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে। তাই সুস্থায়ী জন্মবৃদ্ধির জন্য শিশু

জন্মের হার কমাতে হবে। ১৯৭৬ সাল থেকেই বিভিন্ন স্কলার গণ তাদের গবেষণায় দেখিয়ে ছিলেন কিভাবে নারীদের শিক্ষিত করে তুলতে পারলে মৃত্যুহার, জন্মহার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। এই সকল গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিলো প্রকৃত অর্থে জন্মহারের সাথে শিক্ষার সুগভীর সম্পর্ক আছে নাকি ক্ষীণ সম্পর্ক আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে নারী শিক্ষা ও নারীর প্রজনন ক্ষমতার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান কিন্তু এর ফলে শিক্ষার উপর কোনো প্রভাব পড়ে না। উল্টে যে সমস্ত সমাজে নারী শিক্ষায় জোর দেওয়া হয় এবং নারীর কল্যাণ ও ক্ষমতায়ণের চেষ্টা করা হয় সেখানে সাথে তারা নারীর প্রদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয় যাতে নারীগণ সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী হন।

১৫.৪ বেকারত্ব (Unemployment)

বেকারত্ব দেশের একটি জ্বলন্ত সামাজিক সমস্যা, বেকারত্ব সাধারণ ব্যক্তির জীবনে একটি অনভিপ্রেত, অবাঞ্ছিত অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীন অবস্থার সৃষ্টি করে এবং বেকারত্বের সীমাকাল সেই ব্যক্তির জীবনে দীর্ঘায়িত হলে, তা জীবনের বিভিন্ন সুযোগ ও জীবনযাত্রার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বেকারত্ব একটি গুরুতর সমস্যা যা ভারত স্বাধীন হবার পর থেকে এর সাথে যুদ্ধ করে চলেছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও অপ্রতুলান চাহিদার কারণে ভারতে বেকারত্বের সমস্যা আরোও তীব্র আকার ধারণ করেছে। এছাড়াও, ধীর অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, মৌসুমী বায়ু নির্ভরশীল পেশা, কুটির শিল্পের পতন ইত্যাদি বেকারত্ব সমস্যার সৃষ্টিতে কারণ হিসাবে কাজ করে চলেছে। এখন পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে উঠেছে যে, উচ্চশিক্ষিত যুবক-যুবতীরা বেকারত্বের জ্বালা মেটাতে তারা ঝাড়ুদারের কাজ করতেও প্রস্তুত। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ কৃষিকাজের সাথে যুক্ত এবং কাজটি শুধুমাত্র বীজ রোপণ ও ফসল কাটার এই দুটিতেই কর্মসংস্থান জোগায়। যার বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

বেকারত্ব একটি সামাজিক সমস্যা যা অপরাধের হার বৃদ্ধি করে, রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করে সমাজের বুকে এবং যা শেষ পর্যন্ত জাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

১৫.৫ দারিদ্রতা (Poverty)

দারিদ্রতা বলতে এমন এক সামাজিক অবস্থানকে বোঝায় যা সাধারণত চিহ্নিত করা হয় বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যাশিত জীবনযাত্রার একটি নুন্যতম স্তর দ্বারা, সাধারণত যে পরিবেশে মানুষটি বেঁচে আছে সেই পরিবেশে সুস্থভাবে বাঁচতে গেলে নূন্যতম যেসব প্রয়োজনীয় জিনিসলাগে তার দ্বারা, সেটি যদি উক্ত মানুষের না থাকে তবে তিনি দারিদ্র্য। এই ধরনের ব্যক্তিরা নির্ধারিত সামাজিক জীবনযাত্রার মান থেকে নিচুস্তরে থাকে এদের দরিদ্র বলা হয়। অর্থাৎ একজনের যা আছে এবং একজনের যা থাকা প্রয়োজন এই দুইয়ের মধ্যে যে বৈষম্যের অবস্থা সৃষ্টি হয় তাকেই দারিদ্র বলে।

ভারতবর্ষের একটা বিরাট অংশের মানুষ, খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক

চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারে না। এর ফলে ভারতীয় সমাজ সামগ্রিকভাবে প্রভাবিত হয়। এই অংশের মানুষদের দরিদ্র সমাজ বলা হয়। দারিদ্রতা সাধারণত ধনসম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের অসম বন্টনের ফলে তৈরি হয়। এর পিছনে পশ্চিমী সমাজের শিল্পায়ণ নীতির এবং বিশ্বায়ন অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য প্রভাব আছে। দারিদ্রতা শুধুমাত্র সুযোগের অভাব নিজেক বা নিজের জীবনের কাঠামোকে উন্নত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। দারিদ্র্যের সাথে অর্থনৈতিক অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত যার সরাসরি প্রভাব পড়ে সেই ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন অত্যাবশীয় রসদের উপর, যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, নিরাপদ পানীয়, এবং আয়ের উপর। সংস্কৃতি, ক্ষমতা, সামাজিক কাঠামো ইত্যাদি কারণগুলি মূলত যা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে তা প্রধানত সমাজবিজ্ঞানীরা দারিদ্র্যের কারণ ব্যাখা করতে ব্যবহার করেন, ভারতের প্রায় ২/৩ অংশ মানুষ দারিদ্র্যের নীচে বসবাস করে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজবিজ্ঞানীরা সাধারণত দারিদ্র্য দুই রকমভাবে পরিমাপ করেন

১. চরম দারিদ্র (Absolute Poverty)

চরম দারিদ্র্য বলতে বোঝায় কোনো দেশের জনসাধারণের উপার্জন এত কম যে, তারা জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম পরিমাণ খাদ্যশস্য, ডাল, দুধ ইত্যাদি গ্রহণ করতে পারে না।

২. আপেক্ষিক দারিদ্র্য (Relative Poverty)

বিভিন্ন লোকের আয় যখন তুলনা করা হয়, তখন দেখা যায় এক শ্রেণির লোকের আয় অন্য আর এক শ্রেণির তুলনায় কম। বিভিন্ন লোকের আয় তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন লোকের থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে কম একে আপেক্ষিক দারিদ্র্য বলা যায়। উন্নত দেশগুলিতে দারিদ্র্য আংশিক। অন্যদিকে আমাদের দেশে গণদারিদ্র্য দেখা যায়।

যেকোন সমাজের বিকাশ মাপার ক্ষেত্রে আপেক্ষিক দারিদ্র্য ব্যবহার করা হয়। মানুষ নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে দারিদ্র্যতা মাপার ক্ষেত্রে অনেক সূচক ব্যবহার করে। যেমন অনুন্নত দেশে জল বা ফ্লাশ টয়লেটকে প্রয়োজন অনুসারে দেখা হয় না, সেখানেই আরোও উন্নতদেশে রেফ্রিজারেটর বা টেলিফোনকে প্রয়োজনীয় জিনিস হিসাবে দেখা হয়।

১৫.৬ নিরক্ষতা (Illiteracy)

নিরক্ষরতা বলতে পড়তে ও লিখতে পারার অক্ষমতাকে বোঝায়। নিরক্ষরতা, সারা বিশ্বের অন্যতম বড় সমস্যা। নিরক্ষরতা সাধারণত বিভিন্ন আন্ত সম্পর্কিত বিষয় থেকে তৈরি হয়, জীবনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যে সব পরিবারে প্রবল অর্থনৈতিক বাধা আছে সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়। আবার যে সব পিতামাতা সামান্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত, তারাও শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়। সেইজন্য কোন কোনক্ষেত্রে, নিরক্ষরতা আন্তঃ

প্রজন্মীয় সংক্রমণ হিসাবে পরিচিত। ভারতের সামাজিক প্রেক্ষাপটে যেসব সামাজিক বৈষম্য আছে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিরক্ষরতাকে প্রভাবিত করে। এছাড়া লিঙ্গ বৈষম্য, বর্ণবৈষম্য, প্রযুক্তিগত বৈষম্য ভারতের স্বাক্ষরতার হারকে নির্দিষ্ট করেছে বর্তমান সমাজে।

১৫.৭ সারসংক্ষেপ

ভারতীয় সমাজের সামাজিক সমস্যাগুলি দূরীকরণের ক্ষেত্রে বহুমখী পদক্ষেপ গ্রহণ অতিআব্যশক। আর্থ-সামাজিক উন্নতি সর্বাগ্রে জরুরী। এক্ষেত্রে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

১৫.৮ স্বমূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

১. জনসংখ্যা বিস্ফোরণ কি?

২. অধিক জনসংখ্যার কারণে দুটি সামাজিক সংখ্যার উল্লেখ করুন।

৩. জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কারণে শিক্ষার উপর কিরূপ বিরূপ প্রভাব পড়ছে তা আলোচনা করুন।

৪. বেকারত্ব বলতে কি বোঝেন?

৫. পরম দারিদ্র্য কী?

৬. নিরক্ষরতা বলতে কি বোঝেন?

১৫.৯ অভিসম্বন্ধ (Reference)

Agarwal, J. C (2002) Theory and Principles of Education (13th ed.) New Delhi; Vikash Publishing House.

Bhatia, K & Bhatia, B. D (1992) Theory and Principles of Education (20th Ed.) Delhi; Doaba House.

Bhattacharya, D. C (1996). Sociology (6th ed.) Cacutta Vijoya Publishing House.

Pandey, R.S (2009) Principals of Education (13th Ed.) Agra-2, Agrawal Publications.

Ravi. S. S (2015) A comprehensive sudy of Education (2nd Ed) Delhi; PHI Learning

R.Ahuja, Social Problems in India, Rawat Publication

Sharma, Y. K. (2016) Foundation in Sociology of Education, Delhi; Kaniska Publishers.

Saxena, N.R.S (2009) Principles of Education Meerut; Vinay Rakhija

Y. K. Sharma - Sociological Philosophy of Education-Classique Books

NOTES

NOTES